অন্বেষা

শারদ সংকলন

১৪৩০

সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

অন্বেষা

শারদ সংকলন ১৪৩০

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

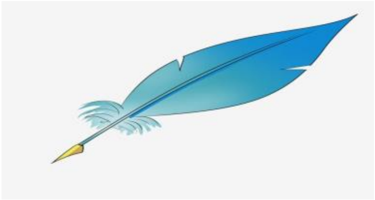

সম্পাদনা

সুধাংশু শেখার পাল ও অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক

এরিকেয়ার

কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন

সি-৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভলমেন্ট কো -অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি , কলকাতা - ৭০০০০৯৪

ওয়েবসাইট :http://aricare.in/index.php

e-mail : aricarekolkata@gmail.com / info@aricare.in

দূরাভাষ : +৯১৯৪৩২২০৯৮৫, ৯৮৩০০৪৪১১০, ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক : মৌসুমী মুখার্জী প্রচ্ছদ : অন্তরা রায়

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে আরো একটা বৎসর অতিক্রান্ত হতে চললো। সময়সূচি অনুসারে আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দুর্গাপূজা পালন করতে ব্রতী হয়েছি। চারিদিকে শুধু সাজো-সাজো রব। সময়ের সঙ্গে বদলায় প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বদলায় দেশের আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা। সুখ-দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্তনে চলতে থাকে জীবন-প্রবাহ। আমাদের কল্পনার আর বাস্তবের মেঘমুক্ত শরৎকাল, মৃদুমন্দ সূর্যালোকে প্লাবিত কাশফুলের নয়ননন্দন নদী কুলবর্তী প্রান্তর অথবা শিউলি ফুলের সুগন্ধমন্ডিত সুষমা ও তাদের নান্দনিক অভিব্যক্তি মাখা শরৎকাল - হয়তো তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি অদ্যপি বাঙালির চিন্তায় ও মননে। এই মানসিকতাই আমাদের পথ চলার আলোকবর্তিকা।

নানা অভাব অনটনে জর্জরিত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন উচ্চ তাপপ্রবাহ ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে জনজীবন। এতো কিছু বিষম পরিস্থিতির মধ্যে দুর্গাপূজার মতো এক বৃহৎ উৎসবের আয়োজন করা, কল্লোলিনী কলকাতার নাগরিক, বিশেষভাবে বাঙালির জীবনীশক্তির আর এক দিক। শহর ছাড়িয়ে দূরদূরান্তের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ছে এক উন্মাদনা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে মাকে বরণ করতে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বীকৃতি লাভের পর কলকাতা তথা বাঙালির দুর্গাপূজার একাধিক দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। এখনো বাঙালির চিন্তায় ও মননে শিল্প সত্তার অভাব হয়নি। বিভিন্ন "থিমের" আর "আর্টের" পূজার আয়োজন কেবল বাংলায় করা সম্ভব বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবেনা। সেই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী পর্যটকের অধিক সংখ্যায় আগমন ও এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক লাভের ব্যাপারটাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার নয়।

"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" এই প্রবাদ বাক্যটা দুর্গাপূজার সার্বজনীন রূপকেই প্রকট করে। এই মিলনমেলায় কে বা নেই - প্রতিমাশিল্পী থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলা ও চারুকলায় দক্ষ শিল্পীমন্ডলীর নিরলস শিল্প ও কর্মসাধনার মূর্ত অভিব্যক্তি আমাদের প্রিয় দুর্গোৎসব। উৎসব শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দলাভের জন্য নয়। আমাদের সকল কার্যকলাপ প্রকৃতিবান্ধব হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় নতুবা এই প্রজন্মের ক্ষনিকের আনন্দ পরবর্তী প্রজন্মের দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই মহান উদ্দেশ্যে ব্রতী হই। আসুন আমরা উৎসবের আনন্দলাভ করার সঙ্গে পরিবেশ বাঁচাই। নিজেদের ও পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত প্রাণিকুল ও প্রাকৃতিক সংসাধনের দীর্ঘ্যস্থায়ী সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

সাহিত্য বিনা উৎসব অসম্পূর্ণ। দুর্গাপূজায় শিল্পসাধনার সঙ্গে বিভিন্ন রচনাবলীর মাধ্যমে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করারও মানসিক ও বৌদ্ধিক বিচারশক্তি বৃদ্ধি করার নিরলস প্রচেষ্টা বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সেবা নিবৃত্ত ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় " অন্বেষা" নামক এক বৈদ্যুতিন পত্রিকা প্রকাশ করা বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপি চলে আসছে। অন্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা "অন্বেষা"র পূজা সংকলন প্রকাশ করছি। যাঁদের সুচিন্তিত অভিব্যক্তি বিভিন্ন কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা ও অন্য রচনাবলীর মাধ্যমে প্রস্তুত করেছেন এবং আমাদেরকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ। আশা করছি ভবিষ্যতে আমরা অন্বেষাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবো। মা আনন্দময়ীর কৃপায় সবাই শারোদোৎসবের আনন্দ উপভোগ করুন। আর সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সম্পাদকমণ্ডলী

সূচিপত্র

কবিতা ৫ - ১৭

বংশীধর মন্ডল , মুক্তিসাধন বসু, সুধাংশু শেখর পাল, লীলাময় পাত্র, চৈতালি দত্ত ও সুপ্রতিম পাল

গল্প ১৮ - ৩৫

গৌতম রায়, অশোক বিশ্বাস ও তনুরূপা কুন্ডু

প্রবন্ধ ৩৬ - ৫১

দেবাঞ্জন সুর, সত্যব্রত মাইতি, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু দাস ও মধুমিতা দাশ

ভ্রমণ কাহিনী ৫২ - ৭৭

কৃষ্ণকিশোর সতপথী, মৃন্ময় দত্ত, উৎপলা পার্থসারথি ও বিনয় কুমার সাহা

ব্যর্থ প্রত্যাশা

বংশী মন্ডল

দেহ মন জুড়ে
রিপুকুলের পিপাসার তুফান,
এতগুলো কাল মহাকাল পার করেও
চাওয়া-পাওয়ার কত না আকুতি।
কিছুতেই মেটে না আত্মতৃপ্তির স্বাদ
ইচ্ছে হয় কাম ক্রোধ লোভ হিংসা গুন- নির্গুণ
না চাইতেই যা কিছু সব পাওয়া,
গাঁটরি বেঁধে জন্মটাই ফিরিয়ে দিয়ে আসি জন্মদ্বারে,
যা চাই, সে আর পাই কই।

মন্ত্র আসেনা ঠোঁটে, শুধুই প্রলাপ আত্মবিলাপ,
ব্যর্থ প্রত্যাশার চোখে নোনা জল, যেন লাল রক্ত।
শুদ্ধ বায়ু পেতে খুলে দিই জানলা
ধেয়ে আসে অন্ধকার, ঘরময় লুটিয়ে পড়ে!

মানবীয় অবিশ্বাসের বন্যা
বিসর্জন দিতে হয়, ফেলে আসা
সহজপাঠের দিনগুলি
দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরি চোখ,
দেহাভিমানে বসে পড়ি জমাট কান্নায়।।

ঠিকানার তল্লাস

বংশী মন্ডল

জৈব পীড়িত ইহকাল শেষ,
নবীন ঠিকানার তল্লাসে আমি
বুকের ভিতর হাড়গোড় ভাঙা পিঞ্জর
সেলাই করা ক্ষতস্থান।

যাত্রা পথে পড়ে আকাশ গঙ্গা,
বেগবতী তার তরঙ্গ;
জল পবিত্র, কারণ একটি লাশও
চোখে পড়েনি ভাসতে।
শক্ত হাতে তরণীর ছই, ছেঁড়া ফুটো পাল,
তীব্র শঙ্কা মনে ভয়,
উত্তাল ঢেউ দেখে ধুকপুক বুক,
ভরাডুবি না হয়।

যাত্রাভঙ্গ তো হতে পারেনা,
মাথার উপর জোনাকি সহায়।
তারাই অনন্ত পথের জ্বলন্ত পিলসুজ,
ফুঁ দিয়ে অন্তত কেউ নেভাতে পারবে না,
তারাই আমার দিগ্ দর্শক,
নিয়ে যাবে বাকিটা পথ।।

অন্তর্দৃষ্টি

মুক্তিসাধন বসু

তোমার কাছে
কবিতা যদি কালোর আঁচড়
ভালোবাসা কয়েকটা অক্ষর
রামধনু কিছু রঙের বাহার
ঝর্ণা এক ঝরে পড়া জলস্রোত
সমুদ্র শুধু সীমাহীন জলরাশি
অরণ্য অনেক বৃক্ষের সমাবেশ
পর্বত প্রাণহীন পাথরের স্তূপ,
তাহলে আমিও
রক্ত মাংস হাড়ে আদিম মানুষ
বিবেকহীন বংশধর শতাব্দীর এপারে !

তা যেন না হয়
সভ্যতার দীর্ঘ যাত্রায়
হেঁটেছি সবাই হাজার বছর
পার হয়ে সিন্ধু সভ্যতা
সূর্য স্নান কাঞ্চনজঙ্ঘায়,
মঙ্গলের উপাসনা চাঁদের মাটিতে
সৃষ্টিসুখ নাড়িতে নক্ষত্রে
চিত্ত জাগুক নব চেতনায়।

তবে এসো,
কান পেতে শুনি,
কবিতারা কথা বলে

ছন্দে, লয়ে, আঁধারে আলোতে

ঝর্ণার উচ্ছাসে রামধনু হাঁসে,

বুক ভরে দেখি,

ঢেউয়ের আবেগ তটকে জড়িয়ে

অরণ্যের দিনরাত্রি মায়াভরা মুখ

পাহাড়ে মেঘেতে মাখামাখি

অক্ষরে সাক্ষরে থাকে আমাদের নাম

গণ আন্দোলন, পৃথিবী বাচুঁক।

কথা রাখো

মুক্তিসাধন বসু

কথা ছিল
শ্রাবনের মেঘ এনে দেবে
কাজল চোখের খামে ,
ঘন কালো জল ভরা মেঘ
ঝড় তুলে অবিন্যস্ত চুলে
সজল ধারায় ধুয়ে দিতে
ক্লান্তি যত বিগত দিনের।

কথা ছিল
বৃষ্টির নুপুর দেবে পায়ে
সুপ্ত বীজে স্বপ্ন জাগাতে,
সুর ভোরে অশ্বিনের কানে।
নবান্নের আহ্বান অঘ্রাণে
সোনালী শষ্যের ভারে
অবনত হতে অনন্ত সবুজে।

কথা ছিল
মেঘের ঠিকানা এনে দেবে
সাগরের চিঠি নিয়ে যাবো
বাদলের বার্তা বয়ে উষ্ম বাতাসে;
শুভ্র মেঘ সাজাতে কাজলে
ঝরে যেতে কলঙ্কিনী হয়ে
মাটির আমন্ত্রণে একান্ত গোপনে
বৃষ্টি তুমি এস, একবার গভীর উচ্ছাসে।

নয়নের ভাষা

সুধাংশু শেখর পাল

কি প্রেমে পড়িনু প্রিয়ে,
নয়নের কোনে কাজল দেখে।
চপলা, চঞ্চলা, হরিণী সম ,
নাচে কাজল রেখা প্রিয়ার মম।
মদিরা কি তুমি করেছিলে পান?
আতুরতা ছিল কি করিতে দান?
নয়নের কোনে রক্তিম আভা,
করেছিল তোমায় আরও মনোলোভা।
কি ছিল ভাষা নয়নে তোমার,
প্রয়াস করেছি পড়িতে প্রিয়ার,
সাগরের গভীরতা দেখেছি নয়নে,
রতনের তরে ডুবেছি অতলে,
পারাপার আমি হইতে পারিনি ,
গভীরে আমি হারায়ে গিয়াছি।
কি জাদু আমি দেখেছি তথায়,
বিমুগ্ধ হলাম মোহিনী মায়ায়,
থাক না সে কাজল নিবিড় হয়ে,
দেখি আমি শুধু চেয়ে চেয়ে।
ভ্রূকুটি আমি দেখি তব নয়নে,
হায় মরি, মরি ; মরমে, মরমে।
নৃত্যের তালে, তালে মৃদঙ্গের বোলে,
চন্দন- চর্চিত অঙ্গ তব দোলে,
নাচে কাজল রেখা প্রিয়ার মম,
সুখ সাগরে ডুবে মোর মন,
নয়নের মণি তুমি, তুমি অপূর্বধন।

অপেক্ষা

সুধাংশু শেখর পাল

সুরভিত অঙ্গরাগ অঙ্গে মেখে,
সুষমার টীকা কপালে এঁকে,
কে তুমি এলে, এলে বনবালা ?
সাজায়ে সযতনে প্রেমের ডালা,
চকিত চরণে কমল নয়নে,
কাহার তরে এলে অভিসারে ?
কোথা থেকে এলে, কোথায় তব নিলয়?
দিনান্তে তুমি যাবে কি কুলায় ?
বিহঙ্গী সম, কাহার দুহিতা ?
অপরূপা করে রচিলো বিধাতা।

ভ্রমরী হয়ে গাহিলে কত গীত,
অবাক হয়ে শোনে সব বনমিত,
মৃদুমন্দ বায়ে কেশদাম তব নাচে,
কৌতুকে তারে লুটোপুটি করে ,
মূক হয়ে সব বনরাজি দেখে,
ছোট বড় পত্রে তব রূপ আঁকে,
ধীরে ধীরে যবে বাড়িলো দিবস,
বনস্থলী তবে হইলো সরব।

অপেক্ষা তোমার হবে কি সমাপন ?
কে তোমার রূপে করিবে স্নান ?
রূপমঞ্জরী কি রহিবে অরণ্যে ?
আসিবে কি রাজপুত্র লইতে বরণ্যে ?

ক্ষনিকের তরে অপেক্ষায় রহ।

মিলন বাসনা হৃদয়ে বহ।

কে ওই এলো বরিবার তরে ,

না ভেসো দেবী নয়ন নীরে,

উজাড় করিও প্রেমের ডালি,

দেখিবে ও তোমার ঈপ্সিত বনমালী।

রাদুবাবুর চায়ের দোকান

লীলাময় পাত্র

রাদুবাবুর চায়ের দোকান
প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এক নাম
সেই পরম্পরা বড় যত্ন করে
আঁকড়ে ধরে
তৃতীয় প্রজন্ম তাঁর 'সত্যসুন্দর'
বজায় রেখে চলেছে সেই গুণমান।

সকালের প্রাতরাশ,
ঠিক যেন বাড়ির স্বাদ,
ঘুম ভাঙা চোখে মুখে বিনিময় সুপ্রভাত।
অনন্য সে স্বাদের টানে,
আর আন্তরিক আপ্যায়নে ;
জনক রোডে রোজ বিকেল নামে
জমে ওঠে আড্ডা অফুরান।

চায়ের সাথে টা'ও আছে বাইশ রকম,
দামও বেশ কম,
স্বাদে-গন্ধে অনবদ্য,
যেন কবিতার অন্তমিল,
হৃদয়ের সুর তাল ছন্দ -
মিলেমিশে একাকার, জীবনের জয় গান।

আছে 'থিন এরারুট '
বাঙালিয়ানার প্রতীক,
দুধ চা, কি লিকারের সাথে
জমে ওঠে ঠিক ঠিক।

রাদুবাবু থেকে সোমনাথ ও সত্যসুন্দর -
তিন প্রজন্ম ধরে সেই ঐতিহ্য
স্রোতস্বিনীর মতো আজো বহমান।

এসেছেন এ দোকানে 'রাজ্ কাপুর'
'রুশি মোদী ' এসেছেন
এসেছেন বাঙালির প্রিয়   মহানায়ক ও মহানায়িকা
সর্বকালের সেরা
উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

সে পরম্পরাও চলমান-
এসেছেন, আসছেন, কত খ্যাতিমান,
গায়ক-গায়িকা, সুরকার- গীতিকার
নায়ক- নায়িকা, লেখক- লেখিকা,
নট –নটি, নাট্যকার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
সলিল চৌধুরী, কত ব্যক্তিত্ব মহান ,
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা,
বাপ্পী লাহিড়ী গেয়েছেন -
" আমার ভালোলাগে জনক রোডের
রাদুবাবুর চা " এই গান।

'শ্রীকান্ত আচার্য', 'জয় সরকার',

'লোপামুদ্রা মিত্র' এ তালিকা অফুরান

এমনই অমোঘ টান

রাদুবাবুর চায়ের দোকান।।

যাপন

চৈতালি দত্ত

এত তিক্ততা, হানাহানি
দেখে দেখে প্রিয়তম দেশ
চিরন্তন আবেদন হারায়,
প্রতিবেশীও অপরিচিত হয়।

আপন আত্মজার জন্য
আশঙ্কায় পরিপূর্ণ মন,
অন্য কোন অনুভূতির
স্থানও নেই তাতে।

এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা
নিজস্ব বলয় নির্মাণ করেছি,
একই গতিপথে নিরন্তর চলাচল;
নষ্ট চাঁদের মত উপলব্ধি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়।

হাহাকার নিত্য বুকে
এই কি জীবন !
না কি জীবন নয়?
এ শুধু যাপন।।

Nostalgia

Supratim Pal

How a year passed away?

In my busiest life's way.

A repetition of all sweet memory,

Of the romantic marriage ceremony.

Did the time move very fast?

Needless to say, to quench my thirst.

Fast occurred all the events,

The amorous and colourful moments.

Like tiny waves of momentary existence

Who thrilled me from distance?

Though busy extremely in profession,

Can I stop all the passions?

How funny would be the reiteration?

গল্প

সুখে থাকো

গৌতম রায়

যদিও এখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি, তবুও বেশ গুমোট ছিল সারাটা দিন। বিকেলের দিকে বেশ একটু বৃষ্টি হয়ে গেল, তাই হটাৎ-ই গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে বেশ একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আবহাওয়াটা। সবেমাত্র সন্ধ্যে নেমেছে, এখন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে বিয়ে বাড়ীর আলোর মালায় চারিদিক কিরকম যেন বসন্ত উৎসবের পরিবেশে সেজে উঠেছে। এই এতো দূরের মাঠের ওদিক থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিয়ে বাড়ীটা। তার ওপর ভীমপলশ্রীর করুন সুরে সানাই বেজে চলেছে। এই সানাই এর সুরেই যেন পুরো পরিবেশটা একেবারে উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে।

আজ দীপার বিয়ে, দীপার মা দীপাকে ভীষণ কষ্ট করে মানুষ করে তুলেছে একেবারে একার হাতে। ওর বাবা যখন চার বছরের ছোট্ট মেয়েকে রেখে অন্য সংসার করতে চলে গেল, দীপার মায়ের সাথে ঝগড়া ঝাঁটি করে - দীপার মা প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সুনীলের কথা শুনে। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি তখন। সেরকম কোনো কারণ ছাড়াই, শুধু এই একদিনের কথা কাটাকাটিতেই কেউ যে নিজের আট বছরের বিবাহিত বউ আর চার বছরের ছোট্ট মেয়েকে এরকম অগাধ জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে একটু নতুন সুখের খোঁজে, তা যেন গোপার মাথায় কিছুতেই আসছিল না। এও কি সম্ভব? বিয়ের পর থেকেই এতো ভালোবাসা, একসাথে স্বপ্ন দেখা, মেয়ে হবার পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়া, মেয়েকে নিয়ে নানান রকম ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা - সেতো মিথ্যে হতে পারেনা! তারমধ্যে তো কোনোরকম অভিনয়ও নিশ্চয়ই ছিলোনা। এতো বোঝার ভুল গোপার কিছুতেই হতে পারেনা। সেরকম আর্থিক সচ্ছলতা কোনোদিনই অবশ্য ছিলোনা, এটা ঠিক, কিন্তু বৌয়ের কোনো সাধ কোনোদিনই অপূর্ণ রাখেনি সুনীল। মেয়ের কোনো দায়িত্ব নিতেও কোনোদিনই পিছপা হয়নি। যখন যেটা দরকার, সেটা ঠিকই ব্যবস্থা করেছিল ও। তবে এটাও ঠিক, শেষের দিকে প্রায় মাস দুয়েক, একটু যেন পাল্টে যাচ্ছিল ও। আগে আগে সুনীল অফিস থেকে বাড়ী ফিরেই দীপাকে আদর করে নিজের একমাত্র সখের সেতারটা নিয়ে বাজাতে বসে যেত। হয়তো ভালো সেরকম কিছু বাজাতে পারতনা, তবু নিষ্ঠাটা ছিল খুবই আন্তরিক। গোপার খুব ভালো লাগতো স্বামীর এই সমস্ত দায়িত্ব সেরে, অফিস থেকে ফিরে সেতার বাজাতে বসে যাওয়ার ব্যাপারটা। গোপা সারাদিনের সব কাজ সেরে, রাতের রান্না সেরে দীপাকে খাইয়ে নিয়ে ওকে কোলে করে বসে যেত সুনীলের পাশে। একমনে ওর

সেতার বাজানো দেখতো, মাঝে মাঝে আলতো করে সুনীলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিত - তোমার সব কাজে আমি আছি, থাকব, আমি ভালোবাসি তোমায়।

কী অপূর্ব ছিল সেই সব দিনগুলো। স্বর্গীয় সুখে ভেসে যেত ওদের ছোট্ট সংসার।
একবারই ওদের বেড়াতে যাবার সুযোগ হয়েছিল ওদের সাংসারিক জীবনে। সেবারে পুজোয় ওরা ঠিক করেছিল কোনো নতুন জামা কাপড় কিনবে না নিজেদের জন্যে। শুধু দীপার একটা মোটামুটি ধরনের জামা কিনে দেবে। তারপর পুজো বোনাসের বাকী টাকাটা নিয়ে ওরা পুরী বেড়াতে যাবে।

দীপা তো নয়ই, গোপাও আগে কোনোদিনও সমুদ্র দেখেনি। তবে সুনীল একবার - সে যখন স্কুলে পড়তো তখন স্কুলের বায়োলজিকাল এক্সকারসনে একবার মাত্র পুরী এসেছিল। তখনই তার প্রথম সমুদ্র দেখা। সুনীলের বারবার সেই অভিজ্ঞতার গল্প শুনে শুনে গোপা মোটামুটি সমুদ্র সম্বন্ধে ধারণা একটা করে ফেলেছিল। সমুদ্রের বিশালতার একটা আভাস করে ফেলেছিল। তাই ভোর রাতে পুরী স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে রিক্সা চেপে যখন স্বর্গদ্বারের দিকে ওরা আসছিল, সেই আগে থেকে ধারণা করে রাখা সমুদ্র-ই দেখতে পাবে ভেবেছিল। কিন্তু দু -একটা রাস্তা ডানদিক, বাঁদিক করে যখন শেষ বাঁকটা এলো - তখনই দেখা হয়ে গেল সমুদ্রের সাথে। গল্প শুনে মনে এঁকে রাখা সমুদ্রের ছবির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন হারিয়ে গেল এই সমুদ্র। এর বিশালতা যেন কোনো কল্পনাতেই আনা সম্ভব নয়। কি স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল সেই তিনদিন। সেই একসাথে সমুদ্রে স্নান করা, বিকেল থেকে বালিয়াড়িতে বসে বসে বালি দিয়ে স্বপ্নের বাড়ী বানানো, সেই ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে দুজনের খুনশুটি – এখন সবই যেন একটা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন ছিল মনে হয়। বালিয়াড়িতে বসে সেই বালির ঘর তৈরীর মতনই যেন ছিল ওদের সেই সংসার।

একদিনের সেই সামান্য ঘটনা নিয়ে কথা কাটাকাটির জন্য কেউ সত্যি সত্যিই সেই সোনার সংসার, আনন্দের সংসার ভেঙে চলে যেতে পারে - গোপার কিছুতেই সেটা মনে হচ্ছিল না সেদিন। মনে হয়েছিল এমনিতে তো মানুষটা রেগে যায়না, কিন্তু এখন রেগে গেছে বলেই হয়ত এরকম বলছে, বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা বলছে। কিন্তু না, গোপার ধারণা সত্যিই সেদিন ভুল ছিলো। সকালে সুনীল রাগারাগি করে না খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন হয়ত ও অফিস গিয়েছিল, অথবা অন্য কোথাও। গোপার নিজেরও খাওয়া হয়নি সেদিন ভীষণ অভিমানে। কিন্তু বিকাল থেকে সেই অভিমান ভুলে আবার রান্না বসিয়েছিল। করেছিল সুনীলের পছন্দমতো সব রান্না। কিন্তু সেদিন সুনীল রাত করে বাড়ী ফিরে নিজের জামা, কাপড়, দরকারী কাগজ পত্র একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী ছেড়ে। যাবার সময় গোপাকে খুব শান্ত অথচ হিম শীতল গলায় কাটাকাটা উচ্চারণে বলে গিয়েছিল কথাগুলো। গোপার বিশ্বাস-ই হয়নি প্রথমে। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। কিন্তু সেই কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজে গোপার। সুনীল কী করে সেদিন বলতে পেরেছিল যে - তোমার সঙ্গে আমি আর থাকতে পারবোনা। আমি চললাম নিজের রাস্তায়। সময়মতো ডিভোর্স পেপার পাঠিয়ে দেব, সই করে দিও। আমি মাসে মাসে তোমাদের জন্য কিছু করে টাকা পাঠিয়ে দেব।
গোপার পায়ের তলা থেকে হটাৎ যেন মাটি সরে গিয়েছিল। কিন্তু যখন কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিক ভাবে পৌঁছল, একটা ভীষণ রকমের অভিমান বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল গোপার। চোখের জলও যেন আসতে ভুলে গিয়েছিল তখন। চোখটা কিরকম যেন জ্বালা জ্বালা করছিল। আর তখন নিজেরই অজান্তে গোপা বলে উঠেছিল - এই চলে

যাওয়াটা যদি তোমার কাছে বেশী সুখের মনে হয়, তুমি যাও। আর কোনোদিন ফিরে এসো না। আমাদের কোনো খোঁজ খবর রেখোনা। মেয়ে বড়ো হলে বলবো - তোর বাবা তোর ছোটো বেলাতেই মারা গেছে। আর তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও, যা প্রাণ চায় করো, আমি কথা দিচ্ছি তোমার কোনো কাজেই আমি বাধা দেবোনা। তবে ওই ডিভোর্স পেপারেও আমি কোনোদিনই সই করবো না। আর তোমার মাসে মাসে টাকা পাঠানোরও দরকার নেই। আমাদের কাছে যে মৃত, তার থেকে কোনো টাকা নেবার কোনো প্রশ্নও আসেনা। বুঝেছ? তুমি যাও, যেখানে সুখে থাকবে - সেখানেই যাও। আমি কোনো ভাবেই আর তোমায় বাধা দেবনা।

ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কাটার পরে, পরের দিন সকালেই গোপার আগের দিনের সমস্ত ঘটনাকেই একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তারপরে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলেও যখন সুনীল ফিরে এলো না, তখনই এই রুক্ষ পৃথিবীর স্পর্শটা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করলো গোপা।

ঘরে কোনো বাজার নেই, চালও প্রায় বাড়ন্ত, এই অবস্থায় মেয়েকে কি খাওয়াবে আর নিজেই বা কি খাবে? নিজে একবেলা না খেয়েও বা দু-একদিন উপোস করেও নাহয় কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তারপর কি হবে? তাছাড়া মেয়েটাকেও তো খাওয়াতে হবে!

এখনও গোপার কাছে এক বিস্ময়, এইটুকু তুচ্ছ ঘটনার জন্যে কেউ কি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে? বিশেষ করে এইটুকু একটা মিষ্টি মেয়েকে ছেড়ে কেউ কি যেতে পারে? সেদিন কি একটা ছোট্ট ঘটনা থেকেই তো হটাৎ এতো বড়ো একটা ব্যাপার হয়ে গেল। আচ্ছা, সেটা কি সত্যি ? ওই ছোট্ট ঘটনার জন্যই হটাৎ এতো কিছু ঘটে গেল? নাকি ঘটনা অনেক দিন থেকেই একটু একটু ঘটে চলছিল, শুধু একটা ছোট্ট স্ফলিঙ্গের - র দরকার ছিল শুধুমাত্র এতো বড়ো ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য?

পরে দেবযানীর মায়ের থেকেও জেনেছিল যে দেবযানীর বাবা দুদিন সুনীলকে দেখেছিল অফিস থেকে ফেরার সময়ে। একদিন তো সঙ্গে এক কালো মতো মহিলাও ছিল ওর সাথে।

ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যাবার পর গোপা মাথা ঠাণ্ডা করে সব কিছু ভাবলো, তারপর সোজা মেয়েকে কোলে নিয়ে চলে গেল ওই বাড়ীর দোতলায়, বাড়ীওয়ালা দীননাথ কাকুর কাছে। পুরো ঘটনা ওনাকে খুলে বলে দীননাথ বাবুর কাছে সাহায্য চাইল। দীননাথ বাবু এবং ওনার স্ত্রী দুজনেই এই গোপা এবং ছোট্ট দীপাকে খুব ভালোবাসেন। তাই গোপার মুখে এই দুর্দশার কথা শুনে গোপাকে তাঁরই কোম্পানিতে আয়ার কাজ নিতে বললেন। দীননাথ বাবু এবং তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে একটা আয়ার সার্ভিস সেন্টার চালাতেন।

শুরু হলো গোপার এক নতুন জীবন। সকাল সকাল উঠে, নিজের জন্যে এবং মেয়ের জন্যে রান্না বান্না করে মেয়েকে মেয়ের দুপুরের খাবার সমেত দীননাথ বাবুর স্ত্রীর কাছে দিয়ে এসে নিজে দুপুরের খাবার টিফিন ক্যারিতে নিয়ে আয়ার কাজে যেতে শুরু করে। রাতে ফেরার সময় মেয়ের জন্যে দুধ, ডিম এবং নিজের জন্য দরকারী জিনিস পত্র কিনে বাড়ী ফিরে আবার রান্না বান্না করে মেয়েকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে নিয়ে রাতের বিশ্রাম।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছরের পর বছর গেল। দীপা স্কুলে ভর্তি হলো, তারপর একসময় স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে ঢুকলো এবং তারও পর কলেজ জীবন শেষ করে চাকরীর চেষ্টা শুরু করলো। ও আর

কোনোমতেই ওর মাকে ওরকম বিরামহীন পরিশ্রমের জীবন চালিয়ে যেতে দেবে না। ও একটা চাকরি পেলেই নিজে সংসারের সমস্ত হাল ধরবে। মা-র তখন শুধুই বিশ্রাম। আর কাজ করে খেটে খেতে হবে না।

কলেজে পড়ার সময়েই দীপার সাথে আলাপ হয়েছিল ওর সহপাঠী প্রবীরের। প্রবীর বড়ো ব্যবসায়ীর ছেলে, কিন্তু তার ভীষণ সংবেদনশীল মন। আর এই সংবেদনশীল মনের জন্যেই ওর মনের কাছে ধরা দিয়েছিল দীপা।

গোপা কিন্তু দীপার সাথে প্রবীরের বিয়েটায় কিছুতেই রাজী হতে পারেনি প্রথমে, মনে দ্বিধা ছিল। বড়লোকের ছেলে, আজ ইচ্ছে হলো - বিয়ে করতে চাইছে, দুদিন পর আর ইচ্ছে হবে না! তখন মেয়েটা কি করবে? কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রবীর আর প্রবীরের মা নিজেরা এসে গোপাকে রাজী করায় এবং অবশেষে বিয়ে। আজ দীপার বিয়ে।

হটাৎ রব উঠলো - বর এসেছে! বর এসেছে! সাথে সাথেই বেশ কিছু শাঁখ বেজে উঠলো। একটা গুঞ্জন উঠলো বাড়ী থেকে। সবারই বর দেখার ইচ্ছে। তার সাথে সাথে বরকে বরণ করে ঘরে তোলার ব্যাপারটাও আছে।

এই বড়ো অশ্বত্থ গাছটার নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সুনীল। সেই অন্ধকার শুরু হওয়ার সময় থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর পায়ে ঝিনঝিন ধরে গেছে। এই জায়গাটায় খুব মশারও উৎপাত। কিন্তু সুনীলের কোনো কিছুর দিকেই খেয়াল ছিলনা এতোক্ষণ। এই গাছটার নিচে থেকে গোপাদের বাড়ীটা পরিস্কার দেখা যায়। কিন্তু উল্টোদিক থেকে ততোটা পরিস্কার দেখা যায় না এই গাছ পাতার আড়ালের জন্যে। সুনীল অপলক ভাবে তাকিয়ে ছিল বাড়ীটার দিকে। ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই যেদিন ও গোপাকে বিয়ে করে আনলো এ বাড়ীতে। ওপরের কাকাবাবু আর কাকীমা ওদের বাবা-মা র মতো ছিল। গোপাকেও ও ভীষন ভালোবাসতো। শুধুমাত্র দরকারে দোকান বাজার আর অফিস যাওয়া ছাড়া ও বাকী সময়টা বাড়ীতেই থাকতে ভালবাসতো। সুনীল কোনো আড্ডা বা ক্লাব বা কোনো নেশা কিছুই করতো না। সুনীলের অফিসে জয়েন করার সময় ছিল সকাল আটটায়। বৌভাতের পরেরদিন থেকেই গোপা সকাল পাঁচটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ঘুঁটে, কয়লা দিয়ে উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিত। সেই আঁচ ধরে গেলেই ও চা করে নিয়ে ভাত বসাতো। তারপর ও সুনীলকে ঘুম থেকে তুলতো। ভাতের পর একটা কিছু ভাজা আর একটা তরকারীও রান্না করে ফেলতো ঠিক সাড়ে ছটা, পৌঁনে সাতটার মধ্যে। সাতটার মধ্যে ভাত খেয়ে, টিফিন নিয়ে সুনীল বেরিয়ে যেত অফিসে। বাড়ী ফিরতো সেই সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ। তারপর চা-জলখাবার খেয়ে গোপার সাথে একটু খুনসুটি করে সেতার টা নিয়ে বাজাতে বসে যেত। এই সময়টা সুনীলের খুব ভালো লাগতো, যত কাজই থাক সব কাজ ফেলে সুনীলের গা ঘেঁসে বসে একমনে গোপা ওর সেতার শুনতো। গোপার হাতটা আলতো করে সুনীলের পিঠে বিলি কাটতো। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাতো সুনীল। গোপা সিঁদুরের টিপ পরতো কপালে আর তার কিছু গুঁড়ো পড়ে থাকত ওর ফর্সা নাকের ওপর। কি যে অপূর্ব লাগতো তখন গোপাকে, সে সুনীলই একমাত্র জানে।

তার কয়েক বছর পর এসে গেল দীপা। দীপা আসার সাথে সাথেই যেন ওদের জীবনে, ওদের সংসারে এক বিরাট পূর্ণতা এসে গেল। দীপা যখন খুব ছোটো, রাতে ঘুমোতো না, কাঁদতো, গোপা ওকে নিয়ে প্রায় সারারাত জেগে বসে থাকতো। মেয়ে একটু কেঁদে উঠলেই বাইরের উঠোনটায় নিয়ে চলে যেত ওকে, যাতে ওর কান্নার শব্দে সুনীলের না ঘুম ভেঙে যায়। গোপার মতে ওর ঘুমটা যে বেশী দরকার ছিল।

দীপা যখন একটু বড়ো হলো, এক পা, দু-পা করে টলমলিয়ে হাঁটতে শুরু করলো আর কতো চেনা অচেনা শব্দে অনর্গল কথা বলে যেত। ও যখন খিলখিল করে হাসতো ওর দুধে দাঁত বার করে, পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন পাওয়া হয়ে যেত ওদের! স্বর্গ বোধহয় একেই বলে!

আজ আর সুনীল কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিল না। চোখের সামনে সেই সব দৃশ্য গুলো যেন এক এক করে ভেসে আসছিল। চোখের জলের বাঁধন মানছিল না কিছুতেই। বুকের ভেতরটা কিরকম যেন অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠেছে।

অথচ, এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। ও তো গোপাকে আর দীপাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। এখনও সেরকমই ভালোবাসে ও। কিন্তু গোপা যে সেদিন সামান্য একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে চাইলো না। কনিকা তো ওর সহকর্মী ছিল। সেই কণিকার সাথে গোপা আর দীপাকে নিয়ে কতো গল্প হতো ওর। কণিকার স্বামী অকালে মারা গিয়েছিল একটা অ্যাকসিডেন্টে। কণিকার সাথে নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া কিছুই ছিলোনা ওর। কণিকার নিজের বলতে কেউ ছিলোনা, সুনীল ছাড়া কথা বলার মতো কোনো মানুষও ছিলো না। তাই ওদের দুজনের রোজকার গল্প করার মধ্যে কোথায় যেন একটা বন্ধুত্বের নির্ভরতাও চলে এসেছিল ওদের দুজনের। গোপার বিয়েতেও এসেছিল কনিকা। পরে মেয়ে হবার পর কনিকা একবার দেখতেও এসেছিল বাড়ীতে।

তখনও অবধি কোনো অশান্তি-ই হয়নি দুজনের মধ্যে। কিন্তু একদিন ঘটে গেল সেই অঘটন। এক দেশনায়কের মৃত্যুতে অফিস হাফছুটি হয়ে যায়, আর সেদিন কণিকার সাথে ও একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, এটাই ছিল ওর অপরাধ। আর সুনীল এখনও বুঝতে পারে না যে সেদিন গোপা সবটা বুঝে গেল কিভাবে। খুব যে দেরী হয়েছে বাড়ী ফিরতে তা ও নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেদিন বাড়ী ফেরার পর গোপা ওকে চা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিল - কি গো, আজ এতো দেরী যে? কোনো জরুরী কাজ ছিলো নাকি?

সুনীল আমতা আমতা করে কি যেন বলেছিল - ঠিক মনে নেই। কিন্তু তারপর থেকে গোপা বেশ গম্ভীর হয়ে যায়। রাতে শোবার পর সুনীল বার বার জানতে চাইছিল - কি হয়েছে ওর? হটাৎ এরকম মুখ ভার কেন? - বারবার গোপা বলছিল - কই! কিছু না তো? কিছুই হয়নি। তুমি ঘুমাও।

অনেকবার জানতে চাওয়ার পর গোপা বলেছিল তুমি আজ আমায় মিথ্যে কথা বলেছ। তোমাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। তুমি মিথ্যে কথা বললে তোমার মুখ দেখে আমি বুঝে যাই। মিথ্যেই যখন বলতে পেরেছ আমায়, তখন নিশ্চয়ই আসল কাজটা আমায় বলার মতো নয়। তাই বলতে পারোনি, মিথ্যে কথা বলেছ। তুমি বলতেই পারতে যে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে! সেটা শুনলে কি আমি রাগ করতাম?

- না, মানে, তুমি জানলে কি করে?

- সিনেমার টিকিট দুটো যেভাবে তুমি খুব লুকিয়ে বিনের মধ্যে ফেলে এলে - তাতে আমার খুব স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ হয়, তাই দেখলাম - দুটো সিনেমার টিকিট ওগুলো। কে ছিল তোমার সাথে? কনিকা?

- হ্যাঁ, মানে ওই আর কি। আজ হাফ ছুটি হয়ে গেল, কনিকা বললো ওই সিনেমাটা নাকি খুবই ভালো হয়েছে, দেখতে যাবে। তাই গেলাম। এ্যই, তুমি রাগ করলে? রাগ করোনা please।

- আজ রাতটাও তো ওখানে ওর সঙ্গে কাটিয়ে আসতে পারতে! বলেনি একবারও?

এই ছিল ওদের দূরত্বের শুরু। তারপর থেকে গোপা যেন কিরকম পাল্টে গেল, অচেনা হয়ে গেল। কথায় কথায় ওকে টীজ করতো, অপমান করে কথা বলতো। নিতান্ত দায়সারা ভাবে সুনীলের কোনো কাজ করতো বা কথার উত্তর দিতো।

সুনীল ওকে অনেক বোঝাতো প্রথম প্রথম। গোপা, কনিকার সাথে আমার শুধুই এক বন্ধুর সম্পর্ক। আর অন্য কিছুই নয়। কিন্তু ওদের সম্পর্কের সেই স্বাভাবিক সুরটা কোথায় যেন কেটে গেল। সেটা আস্তে আস্তে একটা অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে চলে গেল অবশেষে।

এই শীতল সম্পর্ক সুনীল কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। গোপাকে এতো করে বুঝিয়েও যখন কোনো লাভই হলো না, সুনীল অভিমানে গোপার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিল। খুব দরকারে ভাববাচ্যে শুধুমাত্র কথা বলতে শুরু করলো গোপার সাথে।

এই সবকিছুই আলোচনা করতো ও কণিকার সাথে। কনিকাও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তখন সুনীলের দিকে একজন বন্ধুর মতোই।

সুনীলের মনে হতো - ওই বাড়ীতে এরকম বিরক্তিতে ভরে থাকা, ওকে না বিশ্বাস করার মতো মানুষের সাথে ও সময় কাটাবে কি করে? তার চেয়ে আর যাই হোক কনিকার সাথে অন্ততঃ প্রাণখুলে কথা বলা যায়, ও ওর দুঃখের ভাগ নেয়। তাই ধীরে ধীরে প্রায় প্রতিদিনই অফিস ছুটির পর ও কনিকার বাড়ী যেতে শুরু করলো। অনেক গল্প গুজব করে বেশ রাত করে বাড়ী ফেরা শুরু করলো। মাঝে মাঝে কনিকা ওকে প্রায় জোর করেই রাতের খাবার খাইয়ে পাঠাতো তখন। ফলে আরো এক প্রস্থ অশান্তি হতো বাড়ী ফেরার পর। গোপা গজগজ করতো - আগুনে তেতে পুড়ে রান্না করছি আর সেই রান্না নষ্ট করছো। তোমার বাড়ী ফেরার দরকার টা কি? যেখানে খেয়ে আসছো, সেখানে তো থেকেও যেতে পারো! বাড়ী ফেরার দরকার টা কি?

অশান্তি একদিন চরমে উঠলো। একটু রাত করে বাড়ী ফিরে সুনীল দেখলো - দীপার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। কেঁদে কেঁদে চোখে জলের দাগ শুকিয়ে গেছে ওর। চোখের কাজল ঘেঁটে মুখময় হয়ে গেছে। সুনীল প্রায় আর্তনাদ করে দীপাকে দেখতে গেল কাছ থেকে। কি হয়েছে আমার দীপা মা'র? কি হয়েছে ওর? গোপা প্রায় গর্জন করে ওর কাছে তেড়ে এলো। বললো - একদম ছোঁবেনা ওকে। ও শুধু আমার মেয়ে, তোমার নয়। ওর যখন যাবতীয় সবকিছু আমাকেই দেখতে হচ্ছে, তোমাকে আর ওর দরকার হবে না, আমার তো হবেইনা। তুমি যাও এখান থেকে। আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও তুমি! তোমায় না আর আমায় দেখতে হয়! আমার যেভাবে হোক চলে যাচ্ছে। তোমার থেকে কোনো সাহায্য চাইনা আমাদের!

সেই রাতে সুনীল উল্টোদিকে ফিরে শুয়ে অনেক কাঁদলো। ওর সত্যিই আর কোনো প্রয়োজন নেই ওদের। আমার মিষ্টি মেয়ে দীপা, ওকে একবার ছুঁয়ে দেখতেও দিলো না। কি হবে আর এ জীবন রেখে? নিজেকে ভীষণ অপাঙতেও লাগলো। ভালোবাসাহীন এই সংসারে ও থাকবে কি নিয়ে? গোপাকে এতো ভাবে বোঝাবার পরেও সত্যিটা বুঝলো না ও! ও যদি ওকে ভুল বুঝেই থাকতে পারে, থাকুক। ও আর এখানে থাকবে না, ওর আর বাঁচার কোনো ইচ্ছে নেই। সাধও নেই। কেন বাঁচব? কি কারণে বেঁচে থাকবো?

পরের দিন অফিসে ওর কিছুতেই কাজে মন বসছিল না। ঘুরে ফিরে আগের রাতের সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। চোখটা জলে ভিজে যাচ্ছিল। কিছুতেই কোনো কাজ করতে পারছিল না।

টিফিনে কনিকা এসে বললো - কি হয়েছে আজ? সকাল থেকে দেখছি - তুমি কাঁদছ, কি হয়েছে? বলো আমায়?

প্রথমে ও কিছু না, কিছুনা বলে এড়িয়ে যেতে চাইছিল ও। কিন্তু কনিকাও ছাড়ার পাত্রী নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে নিল, তারপর বললো - দেখো সুনীল, গোপা যে এতোটা অবুঝ - সেটা সত্যিই আমার ধারণা ছিলো না। তোমাকে ও বিশ্বাস-ই করে না আর। একটা সংসারে বিশ্বাসের শেকড়টা যদি রীতিমতো মজবুত না থাকে, সে সংসার কিছুতেই টেকে না গো। তুমি একটা কাজ করো সুনীল, তুমি কয়েকটা দিন অন্য কোথাও থাকো, তখন গোপা তোমার অভাবটা ঠিকই বুঝতে পারবে। তখন দেখবে নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করে ডেকে নিয়ে যাবে। কয়েকটা দিন ওকে একা থাকতে দাও। পৃথিবীটা যে কতটা কঠিন - সেটা বুঝতে দাও।

- সেটা যে আমিও ভাবিনি - তা নয় গো। কিন্তু আমি কোথায় যাবো? কোথায় থাকবো? আমাদের তো কোনো সেরকম আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব নেই, কোথায় থাকবে বলো? আর হোটেলে থাকলে তার অতো খরচ মেটাবো কি করে? আর মেসে থাকলে হয়, কিন্তু চাইলেই তো সঙ্গে সঙ্গে তা পাওয়া যাবে না। খোঁজ খবর করতে হবে, দেখতে হবে। সময় তো লাগবে, তাই না? ততদিন কোথায় থাকবো? ওই বাড়ীতে আর আমার ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

তারপর একটু থেমে গলা নামিয়ে কনিকার চোখের ওপর চোখ রেখে সুনীল বললো -

- কনিকা, তোমার কাছে আমায় থাকতে দেবে?

ঠিক ছায়াছবির মত এই সমস্ত ঘটনাগুলো সুনীলের মনে ভেসে বেড়াতে থাকে। এখন ভাবতেই অবাক লাগে - কতগুলো বছর কিভাবে কেটে গেল - সেই যে বাড়ী ছেড়েছিল - আর ফিরে আসা হয়ে ওঠেনি।

কয়েকদিন পরে সুনীলের খুব মন খারাপ হয়েছিল ওর ছোট্ট মেয়ে, ওর প্রাণ - দীপার জন্য। নিজের সব অভিমান সরিয়ে রেখে ও গোপাকে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠায় ওদের জন্যে। নীচে দু এক লাইন লিখেও দিয়েছিল গোপাকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু সেই টাকা ফেরত এসেছিল কয়েকদিন পর। নীচে লেখা ছিল - যে মারা গেছে তার টাকার কোনো প্রয়োজন নেই আমার।

আজ সে ঠিক কি যে করতে চায় সেটা না ভাবনা চিন্তা করেই সুনীল এসে দাঁড়িয়েছিল এই অশ্বত্থ গাছটার নীচে। সন্ধ্যে হবার একটু আগেই চলে এসেছিল। অনেক কষ্ট করে ও খবর পেয়েছে আজ ওর মেয়ে দীপার বিয়ে! কি আশ্চর্য্য, এই তো সেদিন ওর চার বছর বয়স ছিল। এরই মধ্যে ও এতো বড়ো হয়ে গেল। আজ ওর বিয়ে! ওকে দেখতে কিরকম হয়েছে? ওর মুখের আদল টা তো সুনীলের মতোই ছিল। কেমন দেখতে হয়েছে এখন মেয়েটা?

মনটা কিরকম যেন আকুলি বিকুলি করে উঠলো সুনীলের। একবার বাড়ী গিয়ে মেয়েকে প্রাণভরে দেখে, আশীর্বাদ করে আসতে ভীষণ ইচ্ছে করছে আজ ওর। হাজার হোক ও তো বাবা। ওকি একবার ওখানে গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে আসতে পারে না? কিন্তু তারপরেই একরাশ বাধা, জড়তা কাজ করে ওর মনে। আজ এই শুভদিনে ওকে দেখে গোপা যদি আবার কোনো অশান্তি করে? তার effect তো দীপার ওপরেও পড়বে। আর তাছাড়া গোপাতো বলেই দিয়েছিল - সে ও মেয়েকে বলে দেবে ওর বাবা মরে গেছে। তাই যদি হয়, তাহলে এতোদিন পর এই বিয়ের দিন নতুন করে বাবাকে দেখে, পরিচয় পেয়ে ও কিভাবে React করবে - সেটাও তো অজানা! তার চেয়ে এই বেশ ভালো,

দূর থেকে চেয়ে থাকি, একবার যদি মেয়েকে দূর থেকেও দেখতে পাই, বিয়ের সাজে ওর সেই সেদিনের ছোট্ট দীপাকে কেমন দেখতে লাগছে - সেটা একটু দেখতে পেলেই হবে! বেশী কিছু চাই না ওর। ও তো ওদের ওখানে আজ অপাঙতেও, ফেগলু। কি হবে কাছ থেকে দেখে নতুন করে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে? তার চেয়ে এই ভালো!

এতোক্ষণ সুনীল সেকারণেই দূরে এই ঝোপের আড়ালে অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বরের গাড়ী আসামাত্র কিরকম যেন নতুন করে জেগে উঠলো পাড়াটা। সুনীলের এবার খুব ইচ্ছে করতে লাগলো একবার গিয়ে বরকে দেখে আসতে। ওই তো পাড়ার অনেক লোক গাড়ীর উল্টোদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বর দেখছে। সুনীল কিরকম একটা ঘোরের মধ্যে ছুটলো বর দেখতে। মুখটা যথাসম্ভব আড়াল করে।

উল্টোদিকের জানলা দিয়ে এই তো বেশ দেখতে পাচ্ছে সুনীল। ওই তো লজ্জা লজ্জা মুখ করে বর বসে আছে গাড়ীর পেছনের সীটে। বেশ পুরুষালি চেহারা ওর। লম্বায় বেশ ভালোই হবে। মুখের মধ্যে একটা শিশুসুলভ সারল্য রয়েছে। শুধু ওরকম একটা ভারী ফ্রেমের চশমায় ওকে একটু ভারিক্কি লাগছে।

সুনীল মনে মনে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলো ছেলেকে। মন থেকে বললো - সুখী হও বাবা, আমার মেয়েকেও সুখী কোরো। ও ওর বাবাকে পায়নি একেবারে ছোটো থেকে। আমি সবকিছুর জন্য দায়ী। বাবা, পারলে আমায় ক্ষমা করে দিও, শুধু মেয়েটাকে সুখী করো। আমার মতো ভুল যেন কোরোনা তুমি কোনোদিন।

হঠাৎ সুনীল দেখলো - উল্টোদিকে গোপা এসে গেছে বরণের ডালা হাতে নিয়ে। একটা হালকা নীল পাড় সাদা শাড়ি, মনে হয় বেনারসী পরে এসেছে। ওর চোখেও চশমা, চুলে বেশ পাক ধরেছে। সাদা সিঁথিতে মানানসই সাদা শাড়ি গোপার অবস্থান পরিস্কার জানান দিচ্ছে। গোপার গালে সেই মিষ্টি টোল পড়াটা অনেকদিন পর দেখলো সুনীল। ওর বুকের একেবারে নীচ থেকে কিরকম যেন একটা কান্না উঠে আসছে এবার। ও মনে হয় আর সামলাতে পারবে না নিজেকে। ওর খুব ইচ্ছে করছে এখন একটু চীৎকার করে কাঁদতে। ইচ্ছে করছে গোপার কাছে গিয়ে এখন প্রাণ খুলে ক্ষমা চাইতে। ওর এতগুলো বছরের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু কিসের যেন বাধায় সেই মনের কথা মনেই থেকে যায়। পারেনা কিছু বলতে।

বরকে বরণ করে গোপা বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। সাথে সাথে যে সব লোকজন দরজার কাছে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারাও পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল বরের সাথে।

কিন্তু সুনীল? সুনীল কি করবে? ও কি একবার ভেতরে যাবে? ভেতরে গিয়ে মেয়েকে দেখে আসবে? আশীর্বাদ করে আসবে?

কিন্তু - না! ও কিছুতেই সেটা পারলো না। পারলো না যে ঠিক কেন, - গোপার জন্য না কি নিজের কৃতকর্মের জন্যে - সেটাও ঠিক বুঝতে পারছিল না।

এদিক ওদিক কয়েকবার তাকিয়ে, কি করবে ভেবে না পেয়ে, সুনীল আস্তে আস্তে ফেরার উপক্রম করছিল।

- আরে? এটা আমাদের সুনীল না? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? তোমার মেয়ের বিয়ে, আর তুমি এতোদিন পর ফিরে এসে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো? চলো ভেতরে। গোপার কাছে চলো। মেয়েকে আশীর্বাদ করবে না? সম্বিৎ ফিরে পেল সুনীল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বাড়ীওয়ালা দীননাথ বাবু, ওরা যাঁকে কাকাবাবু বলতো!

- হ্যাঁ কাকাবাবু, ভালো আছেন? আপনি তো সবই জানেন। আমার তো এখানে ফেরার, বাড়ী ঢোকার আর কোনো মুখ-ই নেই। কোন মুখে আমি আজ ভেতরে যাব বলুন তো? সারাজীবন অন্যায় করেছি, জেদ করে দূরে সরে গিয়ে গোপার ওপর, দীপার ওপর চরম অন্যায় করেছি। সব সত্যি কাকাবাবু। তাই গোপার কাছে দাঁড়াবার আজ আর আমার কোনো মুখই নেই। আর তাছাড়া আমি আজ গোপার কাছে, দীপার কাছে মৃত। শুধু শুধু আজ আবার সবকিছু নতুন করে ভাবিয়ে কি হবে কাকাবাবু। তার চেয়ে এই বেশ ভাল। ওরা ভালো থাকুক, আনন্দে থাকুক, সুস্থ থাকুক - তাহলেই হবে। তবে হ্যাঁ কাকাবাবু, মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে। সেটার জন্যেই আমি এসেছি আজ। শুধু এখানে এসে আর ঢুকতে সাহস হচ্ছে না আমার।

- আরে দূর, চলোতো তুমি আমার সঙ্গে এসো। এসো বলছি।

- হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি যাচ্ছি, চলুন। শুধু একবার মেয়েটাকে চোখের দেখা দেখেই চলে আসবো। আপনি please আমার কথা ওদের বলবেন না।

- সে সব ঠিক আছে, চলো তো তুমি! চলো -

কাকাবাবু সুনীলের হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে চললেন। সেই দ্বার, সেই উঠোন পেরিয়ে দুটো ঘর। এর বাঁদিকেরটায় ওদের শোবার ঘর ছিল, তার পাশেই ছিল বাথরুম আর রান্নাঘর। ওদের শোবার ঘরের উল্টোদিকটায় একটা ঘর ছিল, কিন্তু সেটা ওদের ভাড়া নেওয়া ছিল না। সাধারণতঃ তালাবন্ধ থাকতো ঘরটা। আজ সেই ঘরটায় কনে বসেছে। সম্ভবতঃ আশীর্বাদ পর্ব চলছে। ওদের শোবার ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে বর বসার।

কাকাবাবু সুনীলের হাত ধরে সোজা গেলেন সেই ঘরে, যেখানে কনেকে তখন - সম্ভবতঃ ছেলের বাড়ীর লোকেরা আশীর্বাদ করছে।

কাকাবাবু সুনীলের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন - এবার দেখো তোমার মেয়েকে। দেখো, চিনতে পারছো? প্রাণভরে দেখো মেয়েকে!

সত্যিই এই দীপাকে দেখে তার সঙ্গে সেই চার বছরের বাচ্চা দীপার কোনো মিল-ই খুঁজে পেলোনা ও। এতো রীতিমতো এক সুন্দরী তরুণী, কি মিষ্টি করে সেজেছে আজ। টুকটুকে লাল বেনারসীতে ফর্সা দীপাকে কিরকম যেন দেবী দেবী মনে হচ্ছে। সুনীল অপলক দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখতে লাগলো আর মনে মনে মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমায় ক্ষমা করো মা, আমি খুব অন্যায় করেছি তোমার কাছে। সারাজীবন অন্যায় করে গেছি। আমার ক্ষমা চাইবারও ভাষা নেই মা তোমার কাছে। তবুও ক্ষমা চাইছি, পারলে আমায় ক্ষমা করে দিও মা।

আশীর্বাদের পালা শেষ। এবার কণেকে ওঠার জন্যে বলছে, এবার বিয়ে শুরু করতে হবে, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় কাকাবাবু বললেন - দাঁড়াও, দাঁড়াও, একজন বাকী আছে, আশীর্বাদ করবে মেয়েকে। - বলেই সুনীলকে প্রায় জোর করেই বসিয়ে দিলেন মেয়ের সামনের আসনে।

আশীর্বাদ করবে কি সুনীল, শুধু হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো মেয়ের মাথায় হাত রেখে।

গোপা হটাৎ সুনীলকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো। তারপর প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে বলে উঠলো - মামনি, ইনি তোমার বাবার বন্ধু, এক সঙ্গে চাকরি করতেন। তোমার বিয়ে শুনে তোমায় আশীর্বাদ করতে এসেছেন। আগে খুবই আসতেন উনি, তোমার মনে নেই।

 - কিন্তু কাকু আপনি এতো কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

সুনীল কিছু উত্তর দিতে পারলো না। শুধু দুচোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চললো ওর গাল বেয়ে ওকে শান্ত করতে, স্নিগ্ধ করতে, পাপমুক্ত করতে।

অন্য এক দিন

অশোক বিশ্বাস

অন্যমনস্কভাবে ঘুরন্ত ফ্যানের ব্লেডগুলো গোনার চেষ্টা করছিল অতীন। ঝুলকালি জড়ানো ব্লেডগুলো ঘোরার সময়ে সিলিংয়ের নিচে একটা কালচে আড়াল তৈরি করছে। সেই সাথে হাওয়া কাটার জন্য মৃদু প্রলম্বিত একটা শব্দ ও তৈরি হচ্ছে। একটু আগে ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে। টিপটিপ করে এখনো পড়ছে বোধহয়। তবুও গরম কমেনি। ঘাম হচ্ছে। আজ তাদের বাড়ির পরিস্থিতি আলাদা। আর পাঁচটা দিনের মত নয়। সকালে শ্যামলদা এসে বাড়িভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য জোরদার তাগাদা দিয়ে গিয়েছে। এমন দু-একটা কথাও বলে গিয়েছে, যা শ্যামলদা আগে কখনও বলেননি। ছয় মাসের ভাড়া বাকি। মোট ছ'হাজার টাকা। এই বাড়িতে অতীনরা প্রায় বিশ বছর আছে। প্রথমে ভাড়া ছিল পাঁচশো টাকা, এখন সেটা এক হাজার হয়েছে। শহরতলীর এই অঞ্চলে এক হাজার টাকায় একটা বারান্দা ও জুটবেনা। বোধহয় শ্যামলদা চাইছে অতীনরা চলে যাক, নইলে এমন করে উনি কোনোদিন কথা বলেন না।

শ্যামলদা চলে যাওয়ার পর আজ সকালে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেটা নিয়েই , বাড়ির সকলে ব্যস্ত। ঘটনাটা ঘটিয়েছে বড়দির ছেলে টুটুন। ওঁর বছর ছয়েক বয়স। সবার নজর এড়িয়ে বাথরুমে গিয়ে একটা জলভর্তি বালতি তুলতে গিয়ে একেবারে চিৎ হয়ে পড়েছিল। ফলে মাথার পেছনে বেশ লেগেছে। তাছাড়া বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ও বালতির আঘাতে বেশ ডিপ হয়ে কেটে গেছে। সেখানে চারটে স্টিচ দিতে হয়েছে। ব্লিডিং ভালোই হয়েছে। রিক্সায় হসপিটালে যেতে যেতে অনেকখানি তুলো রক্তে ভিজে গিয়েছিল। বেশ কষ্ট পেয়েছে বেচারি। এমনিতে টুটুন খুব দুষ্টু নয়। কিন্তু আজ কি যে হল ওর। অতীন যে সময়টুকু বাড়িতে থাকে, সবসময় টুটুন তার সঙ্গেই থাকে। নানারকম আবদার শুনতে হয় ও সেগুলো মেটাতে ও হয়। মাঝে মাঝে সাইকেলে এদিক ওদিক বেড়াতে নিয়ে যেতেও হয়। হসপিটালে অতীন ই কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে অবশ্য বড়দি ও ছিল।

স্টিচ দেওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের টেবিলে তুলতেই বেচারি কান্নাকাটি শুরু করেছিল। বাড়ি ফিরেও খুব কান্নাকাটি করেছে। ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে হাঁপিয়ে গিয়েছিল। আপাতত চুপচাপ শুয়ে আছে শোয়ার ঘরে। তাই, পরিস্থিতি আপাতত শান্ত হলেও উৎকণ্ঠা রয়েছে সবার মধ্যে।

একবার ঘড়ি দেখল অতীন। পৌনে এগারোটা। একটু ব্যস্ত হল ভেতরে ভেতরে। স্বপনদার সঙ্গে আজ কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল তার । স্বপনদা এই পাড়াতেই থাকে। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বর্ডার স্টোরে কাজ করে। অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় আছে। পাড়ার ছেলে হিসেবে অতীনকে কিছুটা সাহায্য করবে বলেছে। দু'একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিল। ইলেকট্রিকাল গুডসের ছোটোখাটো একটা ব্যবসা করার ইচ্ছে অতীনের বহুদিনের। ইলেক্ট্রিকের টুকটাক কাজও জানা আছে তার। কিন্তু স্বপনদার সঙ্গে আজ আর যাওয়া হল না। একটু জোর করলে চলে যাওয়া যেত হয়তো। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাড়ির আর সবাই তাকে স্বার্থপর ভাবতো হয়তো। স্বপনদার সঙ্গে আবার কবে যাওয়া হবে কে জানে !

- দাদা, তোর প্লেটটা এখানে রাখলাম। ছোটবোন অন্তু কোণের টেবিলটায় জলখাবার রেখে চলে গেল।

- চা দিলি না?

- খেয়ে নে। দিচ্ছি। রান্নাঘর থেকে অন্তু বলল। রান্নার দায়িত্বটা বোধহয় আজ অন্তুই নিয়েছে। অন্তু পাঁচ বছরের ছোট অতীনের থেকে। ছোট বলে বাবার ভীষণ ন্যাওটা ছিল। বাবা মারা যাবার পর অন্তুই বোধহয় সবথেকে বেশি আঘাত পেয়েছিল। প্রায় একবছর ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতো না।

বাবা মারা যাবার পর সবকিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। বাবা মারা যাবার ছ'মাস আগে বড়দির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর বড়দি স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দেবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে বাবা মারা যাওয়ার জন্য

বড়দির আর চাকরি ছাড়া হয়নি। উপরন্তু, মা, দুই বোন ও এক ভাইয়ের এই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে হয়েছে।

বড়দি না থাকলে মেজদির বিয়েটাও এতো সহজে হতো কিনা সন্দেহ আছে। বড় জামাইবাবু যখন ব্যারাকপুরের অফিসে পোস্টেড্ ছিল, তখন রানাঘাটে অতীনদের এই ভাড়া বাড়ি থেকেই ট্রেনে ডেলিপ্যাসেঞ্জার ছিল। বড় জামাইবাবু বছর দুয়েক হল ভুবনেশ্বরে বদলি হয়েছে। তাই বড়দিকে সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থেকে যেতে হয়েছে। জামাইবাবু প্রথমদিকে আপত্তি করেনি। ভুবনেশ্বরে দুবছর এক থেকে যাওয়ার পর মনে মনে হয়তো চায় বড়দি চাকরিটা ছেড়ে দিক। অন্যভাবে ভাবলে অতীনের আয়ের সংস্থান হচ্ছে না বলেই হয়তো বড়দিকে বাপের বাড়ি থেকে যেতে হচ্ছে।

- দাদা, তোকে মা ডাকছে। অন্তু বলে গেল। টুটুনের কোন একটা অসুবিধা হয়েছে হয়তো। আবার হাসপাতাল বা ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ অনিত ব্যানার্জির চেম্বারে যেতে হবে বোধহয়। উঠল অতীন।

টুটুন যে ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মা বলল - তুই একবার ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে যা। হসপিটালে যাওয়ার দরকার নেই। যা যা হয়েছে ওনাকে সব বলবি। অনুরোধ করবি যদি কম্পাউন্ডার হীরেনবাবুকে একবার পাঠান। অতীন খাটের সামনে নিচু হয়ে দেখল - টুটুনের সেলাইয়ের জায়গা থেকে আবার রক্ত পড়ছে। হাসপাতাল থেকে গোড়ালিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। সেই ব্যান্ডেজের অনেকখানি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে।

যতটা জায়গাতে রক্তটা ছড়িয়েছে, ততটা রক্ত হয়তো আসছে না। টাইট ব্যাণ্ডেজ এর জন্য রক্ত অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে হয়তো।

- ঘন্টাখানেক তো হয়নি স্টিচ হয়েছে। একটু দেরি করো। এমনিতেই রক্ত পড়া থেমে যাবে। অতীন বলল।

- স্টিচ করার পর তো ব্লিডিং থেমেছিল। কিন্তু একটু আগে আবার শুরু হয়েছে। অনুযোগ করল বড়দি।

- বাচ্চা ছেলে তো তাই দেরি করা যাবে না। তুই চলে যা ব্যানার্জি ডাক্তারের কাছে। মা বলল।

- ঐ ভাবে পায়ের একটু নড়াচড়া হলে তো রক্ত পড়বেই। তাই নিয়ে এত চিন্তার কি আছে ! অতীন বলল।

- ঠিক আছে সেসব আমি দেখছি। তুই ডাক্তারের কাছে যা। বলবি সব। হীরেনবাবুকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করবি। উনি ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখে যাক সেলাইয়ের কোন গোলমাল হল কিনা ! হসপিটালে সেলাই কে করেছিল? নার্স নাকি ওয়ার্ড বয়গুলো ? মা জিজ্ঞাসা করল।

- সেটা খেয়াল নেই। তিন- চারজন হসপিটালের স্টাফ ছিল রুমটাতে।

- কেন? সেলাইয়ের সময় তুই ওখানে ছিলিনা?

- ছিলাম। কিন্তু খেয়াল করিনি। কে সেলাই করছে সেটা বোঝাও যায়না ! কিছুটা বিরক্ত হল অতীন।

মা অতীনের বিরক্ত হওয়াটা বুঝে গেল। বলল - এমন করে উত্তর দিচ্ছিস কেন ? বাড়িতে বিপদ হলে কারোর মাথা ঠিক থাকে না। মা যেন স্বগতোক্তি করল। আর কথা বাড়ালো না অতীন। পায়ে চটি গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলো।

ডাক্তার ব্যানার্জির ক্লিনিকে যেতে গেলে পাড়ার মোড়টা এড়ানো সম্ভব নয়। এখনও এগারোটা বাজেনি। তার মানে পাড়ার বন্ধুরা সবাই হয়তো মোড়ের মাথায় আছে। সকাল দশটার পর থেকে স্কুলের মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দল-বেঁধে স্কুলে যায়। তখন মোড়ে মোড়ে ছেলেদের জটলা বাড়ে - এই নিয়ম বোধহয় মফস্বলের সর্বত্রই বিরাজমান। অতীনদের পাড়াটাও ব্যতিক্রম নয়।

অতীন পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করাটাকে খুব অপছন্দ করে। পাড়ার যে দুই তিনজনের সঙ্গে অতীন মেশে তাদের মানসিকতাও অতীনের মতো।

বিশেষ করে সজল অতীনের মতো একই মানসিকতার ছেলে। সজলের সঙ্গে অতীনের বন্ধুত্ব হাইস্কুলের একেবারে নিচু ক্লাস থেকে। সেই বন্ধুত্ব আজ ও অটুট। সজলেরও একটা কিছু কাজ দরকার। কিন্তু ওঁর সমস্যাটা অতীনের মতো এতো প্রকট নয়। ওঁর বাবার এখনো পাঁচ বছর চাকরি আছে।

পাড়ার মোড়ের কাছাকাছি আসতেই একটু সতর্ক হয়ে রাস্তার লোকজনের শরীরের আড়ালে নিজেকে আড়াল করে বন্ধুদের এড়াতে চাইল অতীন। তাই পা চালিয়ে দ্রুত পেরোলো সে মোড়টা। ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছে দেখল বেশ ভিড়। অনেক কষ্টে পনেরো কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করে ওষুধ দেওয়ার জানলা গলিয়ে হীরেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারল।

- কতক্ষন ব্লিডিং হচ্ছে ?

সময়টা আন্দাজ করে অতীন বলল - প্রায় ঘন্টাখানেক।

- কম না বেশি?

একটু বাড়িয়ে অতীন বলল - ব্যাণ্ডেজ অনেকটা ভিজে গেছে।

কপাল কোঁচকালেন হীরেনবাবু। বিশ্বাস করলেন কিনা কে জানে!

- হসপিটালে কারা স্টিচ করেছে ? জিডিএ স্টাফ নাকি ড্রেসার ?

মাথা নেড়ে অতীন জানালো উত্তরটা তার জানা নেই।

- বাচ্চাটাকে একবার নিয়ে এসো এখানে। দেখি কি হল। নাহলে আর একবার হসপিটালে নিয়ে যাও।

- না, না, হাসপাতাল নয়। আপনি একটু চলুন। অনুরোধ করল অতীন।

- এখানে এখন অনেক ভিড়। ওকে এখানে আনলে ভাল হত।

- ওকে কি আর আনা যাবে ? ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরের ওপর এতবড়ো ধকল গেল। ঘুম ভাঙ্গানো কি উচিত হবে ? যুক্তি দেখাল অতীন।

- ঠিক আছে, তুমি যাও । আমি এক-দেড় ঘন্টার মধ্যে যাচ্ছি। এখানকার ভিড়টা একটু কমুক।

' হীরেনবাবু একটু শুনে যান ' , ডাক্তার ব্যানার্জি ভেতর থেকে ডাকলেন। হীরেনবাবু পেছন ফিরলেন। অতীন চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল - ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলবে কিনা!

- দরকার নেই, আমি কথা বলে নেবো।

বাড়ি ফিরে অতীন দেখল পরিস্থিতি অন্যরকম। টুটুন বমি করছে। সবার উৎকণ্ঠা তাই বেড়ে গেছে।

- কি হল? মায়ের জিজ্ঞাসা।

- হীরেনবাবু এক-দেড় ঘন্টার মধ্যে আসবেন। ক্লিনিকে ভিড় আছে।

- সে তো অনেক দেরি। ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলেছিস?

- না, ঢুকতে পারিনি। অনেক ভিড়। হীরেনবাবুই কথা বলবেন বললেন।

- কেন, তুই বলতে পারলি না ! হীরেনবাবু কি সবটুকু জানে?

- জানে। গলা খানিকটা চড়ে গেল অতীনের।

- তোর কথাবার্তা এমন হচ্ছে কেন ? এখন কি চিৎকার করার সময় ?

- আমি চিৎকার করিনি। অতীন অবুঝ।

- তুই হীরেনবাবুকে আর একবার গিয়ে অনুরোধ কর। ডাক্তারবাবুর সাথেও কথা বলবি।

- ওদের এখন সময় নেই। প্রচুর ভিড়। আমি বারবার যেতে পারবো না। রেগে গেল অতীন।

- তাহলে বাড়ি বসে কি হবে ? তুমি পাড়ার মোড়ে আড্ডায় চলে যাও। বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরাই যা পারি করি !

আরো রেগে গিয়ে চিৎকার করে জবাব দিতে চাইছিল অতীন। এমন সময় আবিষ্কার করল - বড়দি নিঃশব্দে কাঁদছে। টুটুনের বুকের ওপর মাথা রেখে। কেমন যেন অবশ হয়ে যেতে শুরু করল অতীন। তার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল - তোমার বড়দি কাঁদছে অতীন। এখন রাগ দেখানোর সময় নয়। দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো অতীন। রাস্তায় এলো। এখন সে মরিয়া হয়ে একটা খালি রিকশা খুঁজছে। টুটুনকে খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেটাই এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

মায়ের চটিজুতো

মধুমিতা দাশ

বাটার চটি মায়ের খুব পছন্দের জুতো, আর সেটা যদি আমার ছোটভাই নিজের হাতে করে কিনে আনে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। মায়ের বয়স হয়েছে, চলতে গেলে শরীর টলে যায়, বাড়ির মধ্যেই তাই ঘোরাফেরা, বাড়ির ভেতরে চলতে ফিরতে তো আর চটি পড়ার দরকার পরে না, চটিজোড়া তাই পড়া থাকত হয় সিঁড়ির চাতালে, নয়ত বা ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির ধাপে।

বছরে দুবার আমরা বেড়াতে বেরোতাম মাকে সঙ্গে নিয়ে, তখন ই সেই চটিজোড়ার খোঁজ পড়ত, ভাই সেটাকে ঝেড়ে মুছে মুচির কাছে নিয়ে যেত সারাতে, এটা সারিয়ে আনলে মা দু'একবার পরে হাঁটাহাঁটি করত বাড়ির মধ্যে। এটা ছিল রিহার্সাল, তারপর নির্দিষ্ট দিনে চটি পরে আমরা একসাথে বেড়াতে যেতাম। আমি একবার একটা নতুন চটি কিনে এনেছিলাম, বোন ও কিনে দিয়েছিল দু তিনবার, কিন্তু মায়ের পছন্দ হয়নি, নতুন কোনো চটি ই মায়ের পুরোনো চটির মতো প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মতো সেই চটি মায়ের পায়ে সেঁটে থাকত। সময়ের সাথে সাথে সেই চটিও জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হচ্ছিল। তা স্বত্বেও বেড়াতে যাওয়ার পাকা হয়ে গেলেই ভাই চটি হাতে দৌড়োত মুচির পিছনে, সেটাকে সারিয়ে, পালিশ করিয়ে আনত, আর মা সেই চটি পরে রওনা দিতো আমাদের সাথে।

মায়ের বয়স বাড়ছে, শরীর ভারসাম্য হারাচ্ছে , বাথরুম যেতে গেলে মাঝে মাঝেই শরীর টলে যাচ্ছে, বারান্দায় রাখা চেয়ার ধরে সামলে নিচ্ছে , কখনও সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছে। একদিন রাতের বেলা এমনভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল যে কপাল ফেটে গিয়ে একেবারে রক্তারক্তি কান্ড, ভাগ্যিস মেজদা উঠেছিল বাথরুম যাবে বলে সেই সবাইকে ডেকে কাটা জায়গায় বরফ দেয়, ওষুধ লাগায়, মাকে খাটে এনে শুইয়ে দেয়। এই ভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর এল করোনা, বাইরে বেরোবার সুযোগ ও এলো কমে। দরজা, জানলা বন্ধ করে সবাই বসে রইলো ঘরে। দিনের পর দিন বাইরে চাকরি করতে যাওয়া ছেলেমেয়েরা ঘরে আসতে পারল না। কেউ কারোর বাড়িতে পা রাখতো না, ফোন করে খবর দেওয়া নেওয়া চলতো। মায়ের চটি পড়ার সুযোগ ও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। মা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে থাকত কবে আবার আমরা সবাই মিলে বেড়াতে যাবো। সেই বছর পুজোর সময় তাই ঠিক হল গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম, মুকুটমণিপুর হয়ে ফেরা, যথারীতি চটি চলল জুতো সারাইয়ের দোকানে, আমরা জামাকাপড় গোছাতে শুরু করে দিলাম, গাড়ির কলকব্জা দেখিয়ে নিয়ে গাড়িতে তেল ভরা হলো। মা নির্দিষ্ট দিনে চটি পরে গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি করে যাওয়ার শব্দে চটি অনেকক্ষন মায়ের পায়ে সেঁটে রইল। গাড়ি করে যাওয়ার মজাই আলাদা, চারধারে লোকজন, দোকানপাট, রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে যাওয়া যায়, খালি যে গাড়ি চালায় তারই বেশি কষ্ট, একনাগাড়ে গাড়ি চালাতে চালাতে শিরদাঁড়া ব্যাথা করে। গাড়ি করে এই জার্নিটা আমরা বেশ উপভোগ করছিলাম।

ধীরে ধীরে করোনা কমে এল, জনজীবন স্বাভাবিক হতে লাগল, মা আরো একটু বুড়ো হয়ে পড়ল। শরৎকালের নরম রোদ ছড়িয়ে শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে বরাবরের মতো পুজো এসে পড়ল। আমাদের সেবারের গন্তব্য ছিল উত্তরবঙ্গ, এই যাত্রাতে প্রথম থেকেই মনটা খুঁতখুঁত করছিল, পাহাড়ি এলাকায় যেতে গেলে অভিজ্ঞতা থেকেতা খুব জরুরী।এছাড়া দূরের রাস্তায় দু'তিনটি পরিবার একসাথে থাকলে অনেক সুবিধে হয়, আমাদের সাথে আরো একজনকে যাওয়ার কথা ছিল যারা শেষ মুহূর্তে মত বদল করে ফেলল।

দূর্গা দূর্গা বলে রওনা হলাম, প্রথমে গেলাম রায়গঞ্জ, তারপর ডুয়ার্স ঘুরে শিলিগুড়ি। ডুয়ার্সের গরুমারাতে আমরা তেমন কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাইনি। শিলিগুড়িতে এসে সকলেই তাই বেঙ্গল সাফারি করতে চাইছিল, মানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি! তা করতে গিয়ে সন্ধে নেমে এল, রাত্রিরে আর না বেরিয়ে আমরা একটা হোটেল ঠিক করে থেকে গেলাম। এটা আমাদের সিডিউলের মধ্যে ছিলনা। তাই তার পরের দিনের পথটা ছিল অনেকটা লম্বা। হোটেল ছেড়ে সকালেই বেরিয়ে পড়া হল। ভাই চাইছিল সন্ধের আগে যতটা সম্ভব পথ পাড়ি দেওয়া যায়। প্রায় বারোটা বাজে, সকালের জলখাবার খাওয়া হয়নি, খালি চা-বিস্কুট খেয়ে বেরোনো হয়েছিল। খিদে পেয়ে

গিয়েছিল সবাইয়ের। কম বেশি সকলেই ছিল ক্লান্ত, হঠাৎ ইটাহার বাসস্ট্যান্ডের কাছে ভাইয়ের গাড়ি সটান গিয়ে ধাক্কা মারল একটা ছোটোহাতি গাড়ির পেছনে। রাস্তার ওপর গাড়ির চারপাশে লোক জড়ো হয়ে গেল। ভাগ্যিস কারো তেমন চোট লাগেনি। তারপর ইন্সুরেন্স এজেন্ট কে ফোন করা, গাড়ি টো করে নিয়ে গিয়ে মালদার মারুতি গাড়ির ওয়ার্কসপে রেখে যখন মালদার টুরিস্ট লজে পৌঁছলাম, ঘটনার ঘনঘটায় শরীর তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। পরেরদিন ইন্সুরেন্স কাগজপত্র জমা দিয়ে আমি ফিরে গেলাম কাজের জায়গায় আর মায়েরা গেল কলকাতায়।

সেই বছরই কোনো এক সময় মা চটিটা সারাবার জন্য ভায়ের পেছনে লেগেছিল, এতো কিসের তাড়া জিজ্ঞেস করতে মা বলেছিল, যদি কোথাও যাই, সমস্বরে হেসে উঠেছিলাম আমরা।মা কোথায় যাবে, একা তো বেরোতেই পারেনা। তার অল্প কিছুদিন পর থেকেই মাকে যেতে হলো হাসপাতালে, কখনো রক্তচাপ ওঠানামা, কখনো বা অক্সিজেন লেভেল কমে যাচ্ছিল, চটি পরে দু'একবার মা বেরোচ্ছিল, পরে সেটাও আর পারছিলো না। মাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সল্টলেকের আমরি , হালদিরামের কাছে জব চার্ণক এবং মুকুন্দপুর আমরি - এই হাসপাতাল গুলো হয়ে উঠেছিল মায়ের ঘরবাড়ি। সকালে মাকে বাড়ি আনা হল, তো আবার রাত্রেই ছুটতে হচ্ছিল মাকে নিয়ে হাসপাতালে , মা বাইরে বেরোচ্ছিল ঠিক ই , কিন্তু চটি পড়া মায়ের আর হয়ে উঠছিল না। বিনা চটি পরে, অর্ধচেতন অবস্থায় মা ঘুরে বেড়াচ্ছিল হাসপাতালের আই সি ইউ থেকে এইচ ডি ইউনিটে। জীবনীশক্তিও ধীরে ধীরে কমে আসছিল। পরিণতির কথা আমাদের সবারই জানা ছিল। তবু আমরা হাল ছাড়তে পারছিলাম না। নার্সের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যখনি মাকে ভিজিটিং আওয়ার্সে দেখতে যেতাম, মায়ের গা ছুঁয়ে নিরন্তর জপ করে যেতাম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। যদি এইবারটা মা বেঁচে যায়, কথায় বলে, আশায় মরে চাষা। ধীরে ধীরে আশা ও ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তারপর সেই দিনটা এল, হয়ত বা মা চোখ খুলে কাউকে খুঁজেছিল, কোনো প্রিয়জন পাশে ছিল না।

তেষ্টায় হয়তো বা হাঁ করেছিল, কেউ একটু জলও দিতে পারিনি । মা চলে গেল একা। চটি না পরে আমাদের ছেড়ে। নিয়ম করে শ্রাদ্ধ হল, অন্যান্য জিনিসের সাথে ভাই একজোড়া নতুন চটি ও কিনে এনেছিল, সব কিছুর মাঝে ফটফট করে সেই চটিজোড়া চোখে লাগছিল। মা পায়ে লাগত বলে নতুন চটি পড়তে চাইতো না। তাই বলে শ্রাদ্ধে তো আর পুরোনো চটি দেওয়া যায়না। দিন কেটে গেল, মাস ঘুরল, বছরও ঘুরল একদিন। মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও সারা হলো নিয়মনীতি মেনে।

তারপর ও মাঝে মাঝেই মনে থাকেনা যে মা আর নেই। বাড়ি গেলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই দেখা যায় চাতালের ওপর জুতো রাখার জায়গায় মায়ের চটিটা রাখা, বাকি সিঁড়ির ধাপগুলো উঠে এসে বারান্দায় ব্যাগটা রেখে বড়োঘরের দরজা খুললেই দেখি খাটের ওপরটা ফাঁকা, কেউ শুয়ে নেই , মা বেশিরভাগ সময় বড়োঘরের খাটের ওপর শুয়ে থাকত।

গ্রীষ্মের দুপুরে আজও মায়ের ঘরটা পুরো ফার্নেস হয়ে যায়, ঘরে আর কেউ থাকেনা। বৃষ্টির ছাঁটে বারান্দার পর্দা ভিজে যায়, দরজা বন্ধ করার জন্য কেউ আর ডাকাডাকি করেনা। ভাদ্রের কড়া রোদে আলমারীর জামাকাপড় বারান্দায় দেওয়ার জন্য কেউ আর পীড়াপীড়ি করেন। রাত্রে মেঝেতে মাদুর পেতে শুতে গেলে কেউ আর খাটের ওপর থেকে জিজ্ঞেস করেনা, খেয়েছিস ? টিভি চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেউ আর টিভি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করেনা। রাত্তিরে মাদুরের ওপর কুঁকড়ে শুয়ে থাকলেও কেউ আর টলমল পায়ে খাট থেকে নেমে এসে নিজের কাঁথাটা নিয়ে গায়ে চাপা দিতে আসেনা। খোলা দরজা জানলা দিয়ে চড়াই পাখিগুলো ইচ্ছেমতো সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, শীতের রোদে মায়ের কাঁথা কম্বল বারান্দার ওপর রোদ পোহায় না, পুজোর সময় কেনা নতুন জামাকাপড় দেখবার আশায় কেউ আর হাপিত্যেশ করে বসে থাকে না। খালি চটিজোড়া নীরবে অপেক্ষা করে থাকে দুটো জোড়া পায়ের অপেক্ষায়।

অবলার কিছু "বলা" কথা

তনুরূপা কুন্ডু

প্রায় আটমাসের ব্যবধানে গত কয়েকদিন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি মেয়ের কাছে বেড়াতে। দেশে থাকাকালীন মেয়েকে যেমন মিস করি এখন ততটাই মিস করি ওর পোষ্য 'ডবি' কে। এবারে কলকাতা থেকে আসার সময় আমরা সব থেকে উৎসুক ছিলাম এই ভেবে যে আমরা পৌঁছনোর পর দীর্ঘ আট মাসের ব্যবধানে ডবি আমাদের চিনতে পারবে কিনা।

ডবি আসলে একটা পাহারাদার সারমেয়, মাস্টারকে রক্ষা করা ওর প্রধান কর্তব্য। তাই আমাদের পৌঁছনোর পর আমাদের দেখা মাত্র ও ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। দূর থেকে হাত বাড়িয়ে ওকে আদর করার চেষ্টা করলে ও আমাদের কাছে এসে শুঁকতে চাইলো। আমরা ওকে শুঁকতে দিলাম। শোঁকা শেষ হলে ঘেউ ঘেউ করা বন্ধ করে ও আমাদের সঙ্গে বন্ধু করল। এবার ওর লজ্জা পাওয়ার পালা। যেমন বাড়িতে ছোট বাচ্চারা নতুন বা দীর্ঘদিন পরে দেখা আত্মীয়দের দেখে প্রথমে লজ্জা পায় তারপর দিব্যি তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার আর পিছু ছাড়েনা। আমাদের সঙ্গেও ডবি ঠিক তাই করল। লজ্জায় প্রথম আধঘন্টা আমার মেয়ের পিছনে লুকিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল। এখন আবার আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে অনেক অন্যায় আবদার ও আদায় করে নিচ্ছে ও।

কখনো মাথা চুলকে দিতে হচ্ছে। কখনো আবার পিছনের লন দিয়ে ওর শত্রু (পাশের আপার্টমেন্টের একটা কালো বুলডগ) গেলে টের পেলেই ঘেউ ঘেউ করে এসে নালিশ জানানো হচ্ছে, আর বারবার ব্যালকনির দরজাকে লক্ষ্য করে সেটাকে খুলে দেওয়ার জন্য ঘেউ ঘেউ করে বায়না করা হচ্ছে। ভাবখানা এমন যেন বলছে " খুলে দাও তো দিকি ব্যাটার সঙ্গে আচ্ছা করে একটু ঝগড়া করে আসি " . খাবার নিয়েও তার অনেক আবদার। ও নিজের খাবারের সময় মনে করিয়ে দেয়। সময় হলেই কুঁই কুঁই শব্দ করবে। তার ভেজ খাবার মোটেও পছন্দ নয়, নন ভেজ খুব পছন্দের। সকালে ওকে ব্রেকফাস্টে শুকনো খাবার kibbles দেওয়া হয়। ওর ওজন একটু বেড়ে যাওয়ায় ওজন কমানোর জন্য একটা নতুন ফর্মুলার kibbles আনা হয়েছে। ওটা ওনার এতটা পছন্দ নয় তাই ওটা খেতে খুব সময় নেয়। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল অব্দি যায়। প্রথমে খাবার দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে আসবে। অনেকপরে অগত্যা কোনো উপায় নাই দেখে আস্তে আস্তে খেয়ে নেবে। রাতে যে ভিজে নন ভেজ খাবার দেওয়া হয় সেটা ওর খুব পছন্দের। ওটা দিলেই নিমেষের মধ্যে খেয়ে মুখ চাটতে থাকবে। আমি গতকাল ওকে সেই kibbles ব্রেকফাস্ট দিয়েছিলাম। দেখলাম যথারীতি তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে এলেন।

`রান্নাঘরের পাশেই ওর খাবারের বাটি রাখা থাকে। আমি রান্না করি আর ও ওখানে বসে আমার রান্না করা দেখে। রান্না করতে করতে আমি বার কয়েক ওকে বললাম ' যা খেয়ে নে ' । যতবারই বলি ও তখন বাটিতে রাখা খাবার একটু শুঁকে এসে আমার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকে, যেন বলছে " যেন না ওই খাবারটা আমার পছন্দ নয়। " তা দেখে আমি ওর রাতের জন্য রাখা non-veg থেকে সামান্য কিছু দিয়ে ওর খাবারে মিশিয়ে দিলাম। নিমেষের মধ্যে ও পুরো খাবারটা খেয়ে নিল। মেয়ে এই ঘটনা শুনে তো রেগে গেল, বলল ওকে যখন outstation ট্যুরে যেতে হয় তখন ডবির জন্য ওই শুকনো খাবারই Day care / Boarding center এ দিয়ে যেতে হয়। অতএব ওকে ওই খাবার অভ্যাস করতে হবে। যাইহোক ভাবলাম পরের দিন আর দেবোনা। কিন্তু আজ সকালে আবার একই ঘটনা। আমি রান্না করছি আর বলছি ' যাও, খেয়ে নাও' ।

আজ আবার lunch এ আমাদের জন্য চিকেন করছি। ফ্রিজ থেকে বের করা মাত্র ডবি গন্ধ পেয়েছে তাই আজ ও একটু বেশি excited। আবার ওকে বললাম 'আজ খেয়ে নাও কিন্তু kibbles'। কোনোরকম বায়না করবে না। ওটা তোমার জন্য হেলথি খাবার। ও আমার দিকে আবার কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকলো। তারপর আমার কাছে এসে ওর সামনের পা দিয়ে কিছুটা আমার ওপরে চড়ে আলতো করে আঁচড়ালো আমার হাতে। যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম ' আজ দিয়ে দাও কাল থেকে আর চাইবো না' । আমি আর কি করি একটু চিকেন আলাদা করে ওর জন্য সিদ্ধ করে ওর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম আর অমনি কপাত কপাত করে খেয়ে নিমেষে শেষ করে দিলো। আজ মেয়েকে আর বলিনি। বললে বলবে 'আদরে বাঁদর বানাচ্ছো ডবিকে'।

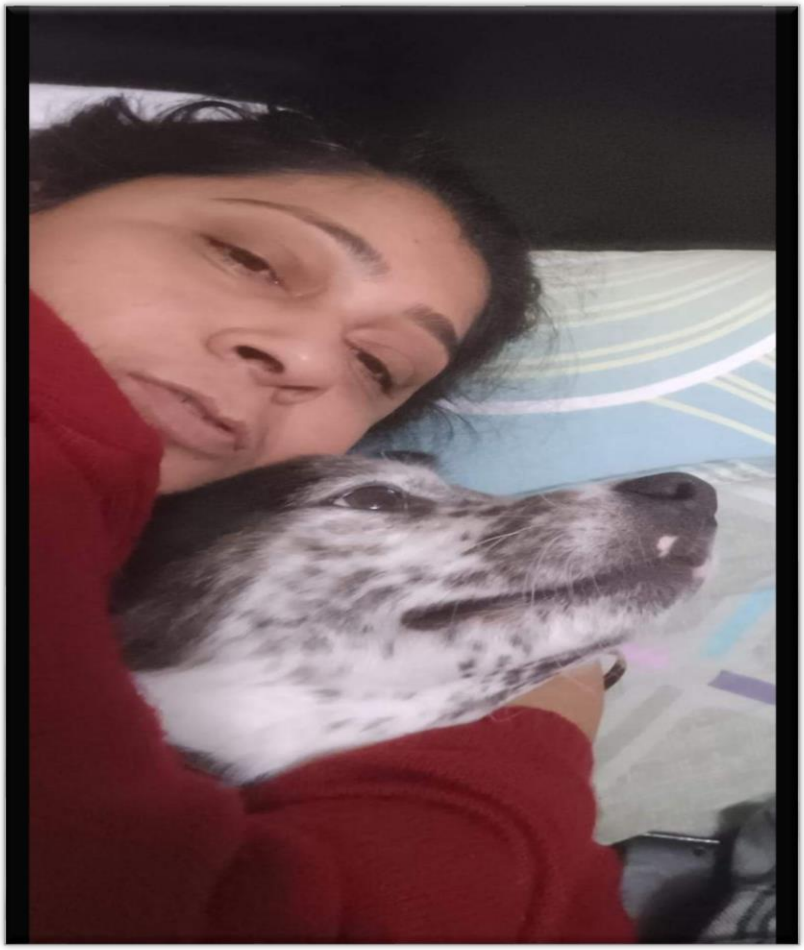

প্রবন্ধ

কেন এতো বন্যা?

কৃষ্ণেন্দু দাস

ভৌগোলিকভাবে ধরতে গেলে প্রায় অর্ধেক পশ্চিমবঙ্গই "বন্যাপ্রবণ"। নগরায়ণের সঙ্গে বন্যা প্রতিরোধেরও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নদীকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করতে হলে নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ অববাহিকায় বিভিন্ন কর্মপন্থার প্রয়োজন। আমাদের এই রাজ্যে থেকে আর কতটুকু করা সম্ভব? প্রায় সব নদীই অন্যদেশ বা অন্যরাজ্য থেকে উৎপত্তি হয়েছে, আবার অনেকগুলোই ভিন দেশে গিয়ে শেষ হয়েছে। অন্যরাজ্য বা অন্যদেশ এর অধিক বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের এই ছোট রাজ্যকেই ভুগতে হয়। ফলস্বরূপ আমাদের অংশের নদীর পাড় বা তার কাছাকাছি অংশ ধরেই মূলত বন্যা প্রতিরোধের প্রায় সব ব্যবস্থাদি চলে।

প্রথমদিকে নদীর পাড় থেকে অনেক দূরত্ব রেখে নদী বাঁধ হতো। অনেক জায়গায় নদীবাঁধ হতো একদিকে অর্থাৎ যেখানে জনবসতি বেশি যা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি শহর - বাজার গড়ে উঠেছে। জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে নদীবাঁধকেও আর নদীর পাড় থেকে বেশি দূরে রাখা যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে - এক পাড়ে কেন দুই পাড়েই নদী বাঁধ করতে হয়েছে। জমি তো সীমাবদ্ধ, তাই বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শিল্পনগরী ইত্যাদি সবকিছু স্থাপনে, জমির প্রয়োজন বৃদ্ধিতে একদিকে যেমন " বন কেটে বসতি" বা চাষযোগ্য জমি তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে যদি, খাল,বিল - তার উপরেও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ছোট বড় পুকুর, জলাশয় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বলতে কি, লবন-হ্রদ কে ভরাট করেই তো সর্বজনবিদিত "বিধাননগর" সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকি মানুষের প্রয়োজনে, পরিমিত ভরাটের জন্য অপেক্ষা না করে সুন্দরবন এলাকায় বা ভুতনি -দিয়াড়ায় জনবসতি গড়ে উঠেছে। নদীর প্রাকৃতিক খাত ধীরে ধীরে দখল করে নিয়ে আমরা নদীকে শাসন করতে চাইছি। তা ছাড়া আমাদের প্রয়োজনে খোদ নদীর বুকের উপরেও তো কম কান্ড চলছে না।

নদীর খাত আজ ভুমিক্ষয়জনিত পলিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও পাশের জমি থেকেও নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্রই জমির মাটি-বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে ধুয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে।নদীর দুই পাড়ে যদি, বনস্পতিক আচ্ছাদন, যেমন ছোট বড় গাছ, গাছালি, ঘাস, লতাগুল্ম ইত্যাদি থাকতো অনেক মাটি তাহলে আটকে যেত। নদীর খাতগুলি এত তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যেত না। যে বিপুলভাবে নদীর খাতগুলি আজ পলি আকীর্ণ , তা তোলা সম্ভব হলেও রাখার বোধ করি জায়গা সংকুলান হবে না। কি বিশাল অর্থ, প্রক্রিয়া ও কর্মকান্ডের প্রয়োজন। আর তাছাড়া বৃহৎ বৃক্ষ - বনানী রোহিত পাড় থাকলেও নদী খাত আবার ভরাট হয়ে যেতেও বেশিদিন সময় নেবে না। বন্যার মাধ্যমে প্রকৃতি -তাড়িত যে স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে বলে একদিন বিবেচিত হতো, তাও আজ অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীর সাবলীল গতি আজ বিভিন্ন ভাবে রুদ্ধ, বাধা প্রাপ্ত।

অনেকে বলে থাকেন বৃষ্টির জল থেকেই তো বন্যা হচ্ছে, তাই আমরা যদি বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারি তাহলে তো আর বন্যা হবেনা। খুবই ভালো কথা। কিন্তু বৃষ্টির জল কোথায় ও কিভাবে রাখা যাবে? জল ধরে রাখতে তো জমির প্রয়োজন - ছোট-বড় বাঁধ, পুকুর,জলাশয় ইত্যাদি করতে হবে। এই ছোট রাজ্যে প্রয়োজন মিটিয়ে আর কতটুকু জমি এইসব বাঁধ, জলাশয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। যেখানে পূর্বস্থিত পুকুর, জলাশয় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই বিপুল সংখ্যক পুকুর-জলাশয় নতুন করে তৈরি করা কষ্ট কল্পিত হবে না তো? তাই আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে বন্যা নিবারণে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে উঠতে পারি, যেন সমস্যার মূল থেকে আমরা এগোতে পারি।

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর

দেবাঞ্জন সুর

ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের চালিত করে একটি প্রশ্নের দিকে - " ঈশ্বর কি?" .এই ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝি, যাঁকে আমরা পূজা করি, যিনি আমাদের শুভ -অশুভ নির্ধারণ করেন এবং যিনি এই বিশ্ব - ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। যদিও আমাদের অনেকেরই ধারণা, বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়না, অনেক বৈজ্ঞানিক ই কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্মাচারের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখেন না। তাহলে কি বিজ্ঞানে আস্থা ও ঈশ্বরে(ধর্মের ভগবানে) বিশ্বাসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক সম্ভব?

কোনো বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনে দুটি সমস্যা হয়। প্রথমটি হলো - বিজ্ঞান সবসময় প্রশ্ন করতে শেখায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে এই বোধের প্রয়োজন যে, কোনো কিছুই নিশ্চিত বা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো - বৈজ্ঞানিক তথ্যভান্ডার যত সমৃদ্ধই হতে থাকুক না কেন, আমরা "সত্য" কে জানতে পারিনা ; বিজ্ঞান আমাদের জানায় না কোনটা সত্য এবং কোনটা অসত্য , বরং জানায় যে, কোন ও ঘটনা বা তত্ত্বর সত্য হবার সম্ভাবনা (probability) কতটা বেশী অসত্য হবার থেকে। অর্থাৎ, কোনো একটা বিষয় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হলেও, তার মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা (uncertainty) থেকে যায়। বিজ্ঞানের প্রতিটি জ্ঞান বা ধারণা, নিশ্চিত সত্য ও নিশ্চিত অসত্যের মধ্যেকার পরিসরের কোনও একটি স্থানে বিরাজ করে। এটা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের বিভিন্ন বিষয়েও আমাদের বিচার যে কতটা সঠিক হয়, সে ব্যাপারেও আমাদের দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা থাকে। আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরগুলো সঠিকভাবে জানতে পারিনা, এই অনিশ্চয়তার উপলব্ধি বৈজ্ঞানিকদের মননে থাকা একান্তভাবে কাম্য। এই অনুষঙ্গেই প্রশ্নটা পরিবর্তিত হয় - " ঈশ্বর আছে কি?" থেকে " ঈশ্বর আছে, এই ভাবনা কতটা নিশ্চিত ? " এই প্রশ্নের পরিবর্তনই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি করে।

বিজ্ঞান ও ধর্মভাবনার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও, মানুষের শুভ-অশুভ(moral) ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বস্তুতঃ সেই ধারণা বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। এটা নিয়ে একটু বিশদে বলা যাক।

যখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে , " আমার বা আমাদের কি এটা করা উচিত?", তখন অনেকেই ধর্মীয় ভাবনার আশ্রয় নেন। এই প্রশ্নটিকে আমরা দুইটি পর্যায়ে ভাঙতে পারি। প্রথমটি হলো " আমি যদি এটা করি, তার ফল কি হবে? ; এবং দ্বিতীয়টি " আমি কি এই ফল কামনা করি ?" ; " আমি যদি এটা করি, তার ফল কি হবে " এই প্রশ্নের স্বরূপ একান্তভাবেই বৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ এই ধরণের বহু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ওপরেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে। এই উত্তর খোঁজার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হলো - এটা করার চেষ্টা করা এবং তার ফল কি হয় দেখা।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিশাল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে আজ পর্যন্ত। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেই প্রশ্নটি বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে।

কোনও কাজের ফল কি হবে - এর উত্তর যখন আমরা পেতে চাই, তখন আমরা এটাও বিচারে রাখি যে , সেই ফলের মূল্য কি হবে, যেটা থেকে আর এক প্রশ্নের উদ্ভব হয় : এটা আমার করা উচিত কি? এই ঔচিত্যের বিচার কিন্তু বিজ্ঞান শেখায় না, সেটা শেখায় আমাদের শুভ - অশুভ ধারণা। এই প্রেক্ষিতে, আমরা মেনে নিতে পারি যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের শুভ -অশুভ ধারণার কোনো সংঘাত নেই। অনেক বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু তাঁদের ঈশ্বর ভাবনা তথাকথিত ধর্ম - আধারিত ঈশ্বর ভাবনা থেকে আলাদা। এইসব বৈজ্ঞানিকদের কাছে ঈশ্বরের

অস্তিত্ব অনেকটা এইরকম - ঈশ্বর আছেন, এটা অনেকাংশেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা পূর্ণরূপে নিশ্চিত নয়।

পরিশেষে জ্ঞাতব্য - বিজ্ঞানের ধর্মই হলো সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে তার উত্তর খোঁজা। বস্তুতঃ এই প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমেই বিজ্ঞান এক কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনে আমাদের সাহায্য করে। অবধারিতভাবে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেই অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে। ধর্ম জানায় যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি। বিজ্ঞান এক ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করে, ঈশ্বর কার সৃষ্টি? ধর্মের উত্তর - ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ (self-created) . তখন বিজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য - তাহলে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের " স্বয়ম্ভূ" হতে বাধা কোথায় ? বস্তুতঃ এই ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি -রহস্য উদ্ঘাটনে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সেই স্বয়ম্ভূ-তত্ব বা মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটনার স্বরূপ নির্ধারণে সচেষ্ট আছে।

বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের মধ্যে আমরা এক ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিবাসী, যেটা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, এবং সূর্যের মতো কয়েক কোটি তারাদের উপস্থিতি আমাদের গ্যালাক্সীর (ছায়াপথ) মধ্যে, যেটা আবার কয়েক কোটি গ্যালাক্সীর মধ্যে অন্যতম। আমরা এটাও জানি যে ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু - তারারা , সূর্য, পৃথিবী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী - সবই অনু-পরমাণুর সমাবেশে নির্মিত। এই বস্তুপুঞ্জের বিশালতা ও রহস্য যেহেতু অনেকাংশেই এখনও অজানা, সেহেতু ঈশ্বরই এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, এই বিশ্বাস এখনও খুব একটা আধুনিক বিজ্ঞান - চেতনার অনুসারী নয়।

খাবার নিয়ে ভাবার আছে

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

অতি সম্প্রতি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি প্রতিবেদন থেকে জানতে পারলাম সারা দেশেই আনিমিয়ার ব্যাপ্তি বেশ ব্যাপক। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে লাদাখের পরেই শতকরা হিসেবে সবচেয়ে বেশি মানুষ ভুগছেন আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পশ্চিমবঙ্গে সারা বছর ধরে নানা ধরণের শাকসবজি ফলমূল উৎপন্ন হয়। সবজি চাষ , মাছ চাষ , এবং ধান চাষে আমরা বরাবরই অগ্রণী রাজ্য। পুষ্টি প্রাপ্তিতে আমরা এতো পিছিয়ে কেন তা একটু ভাববার বিষয়।

কোথায় কত এনিমিক

লাদাখ	৯২.৮	বিহার	৬৩.৫
পশ্চিমবঙ্গ	৭১.৪	পাঞ্জাব	৫৮.৭
ঝাড়খন্ড	৬৫.৩	উত্তরপ্রদেশ	৫০.৪
গুজরাট	৬৫.০	দিল্লি	৪৯.৯
ওড়িশা	৬৪.৩	কেরালা	৩৬.৩

(১৫-৪৯ বছরের মহিলাদের হিসেবে শতাংশে)

(সূত্র: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট)

রক্তে লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন কমে গেলে রক্তাল্পতা হয়। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে মূলতঃ আয়রন ও ভিটামিন বা-১২ এর ক্রমাগত ঘাটতির কারণে হয়। আবার আয়রন শোষিত হতে ভিটামিন সি এর সাহায্য দরকার হয় , যা পাওয়া যায় বিভিন্ন লেবু, টমেটো, পেয়ারা ইত্যাদি থেকে। তাই আমাদের খাবারে এগুলির কোন একটির অন্তর্ভুক্তি রোজ চাই। আমাদের দৈনন্দিন খাবারে যদি থাকে প্রায় ৫০ ভাগ দানাশস্য ভিত্তিক উপাদান যেমন ভাত, রুটি (গমের আটার সাথে সামান্য রাগি আটা, বাজরা আটা , কিংবা জোয়ার আটা সামান্য মেশানো থাকলে এটি ভালো হয়), বাকিটা পূরণ হোক ফল, গাঢ় সবুজ সবজি, নানা ধরণের স্থানীয় শাক, স্থানীয় মাছ, বিশেষত ছোট মাছ, দেশি মরসুমি ফল যেকোন একটি তা পেয়ারা, পাকা পেঁপে , সবেদা, বাতাবি লেবু, তরমুজ, আমলকী যাই হোক না কেন। আর স্থানীয় শাক বলতে কলমী, মেথি, গিমে, হিঞ্চে, পালং ইত্যাদি। আমাদের উদ্ভিদজাত প্রায় সমস্ত খাবারে কিছু না কিছু আয়রন শোষণকারী যৌগ যেমন ট্যানিন, পলিফেনল, ফাইটেট, অক্সালেট ইত্যাদি থেকে যায়, তাই অতিরিক্ত চা, কফি, সয়াবিনের বিভিন্ন প্রোডাক্ট খাওয়া থেকে বিরত থাকাই ভাল। এই যৌগগুলিকে আন্টি নিউট্রিয়েন্ট বলা হয়। বিভিন্ন বি গ্রুপের ভিটামিন যা বিপাক ক্রিয়ায় জরুরি তাদের একটি সহজ উৎস হল কল বেরোনো ছোলা, সবুজ মুগ ইত্যাদি। এগুলি থেকে একটি বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় কারণ এরা অনেক ফাইবারও যোগান দেয় যা

আমাদের পরিপাকের সহায়তা করা ছাড়াও খাদ্যনালীকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। পরিপাকক্রিয়া বাধাহীনভাবে হওয়ার জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল একান্তভাবে দরকার। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গঠনমূলক ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য হলেও দুধ বা বিশেষ করে দই খাওয়া খুব দরকার। ক্যালসিয়ামের একটি সাধারণ উৎস হল তিল। অপজারক হিসেবে ভিটামিন ই আমাদের চাই। ক্যারোটিন ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

বিভিন্ন প্রকার ভোজ্য তেল ও মাছ, ডিম থেকে আমরা ভিটামিন পাই। আমাদের কড়া আঁচে বা খুব গরম তেলে রান্নার কারণে এই ভিটামিন যেহেতু অনেকটা নষ্ট হয়, তাই রান্না লো ফ্লেমে করতে পারলে লোকসান কম হয়। দূষণের কারণে নানা ধরণের ফ্রি রেডিক্যাল আমাদের শরীরে তৈরি হয়। নানাভাবে তা আমাদের ক্ষতি সাধন করে। এদের জমতে বাধা দেয় কিছু শাক-সবজি যেমন কাঁচা লঙ্কা, যাতে আছে ক্যাপসাইসিন, গাজর, ক্যাপসিকাম ইত্যাদিতে আছে ক্যারোটিন আর টমেটোতে আছে লাইকোপিন। এগুলি দূষণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ। মাছে প্রোটিন ছাড়াও আছে বিভিন্ন দীর্ঘ-শৃঙ্খল ওমেগা-৩, ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়াও কোলিন। মস্তিষ্কের দৈনন্দিন কাজ চালাতে এর ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের নাগালের মধ্যে পাওয়া শাক-সবজি, ফলমূল, ছোট দানার শস্যাদি থেকে তৈরি খাবার ছোট ছেলেমেয়ে সকলকে নীরোগ শরীর দিতে সহায়তা করে। আমরা শুধু তো বাঁচার জন্য খাইনা , রসনার তৃপ্তির বিষয়টি সততই গুরুত্ব পায়। তবু দেখতে হবে শরীর যেন ঠিক মতো পুষ্টি পায়,সুস্থ থাকে, ও আমরা কর্মক্ষম থাকতে পারি। কিছু অসুখ যেমন জুভেনাইল ডায়াবিটিস, থাইরয়েডজনিত অসুখ, উচ্চ রক্তচাপ ও সেইসঙ্গে হার্টের সমস্যা এমনকি কিডনির সমস্যা আমাদের বিচলিত করে। খাদ্যাভ্যাসের দিকে একটু নজর দিলেই কিছুটা তো সুরাহা হয়ই। খাদ্যে ভেজালের কারণে, অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক প্রয়োগের কারণে সমস্যা তো লেগেই থাকে। সকলের পক্ষে জৈব খাবার পাওয়া সম্ভব নয়। বাচ্চার দৈনন্দিন পুষ্টির ভারসাম্যে মাছ একটা রক্ষাকবচ, এটা মনে রাখা দরকার। পুষ্টির স্বল্পতা থেকে রক্ষা পেতে শুধু শস্যই নয়, সব জলাশয়েই হোক রকমারি মাছের ফলন। ধান, মাছ, সবজি ফল, দুধ, ডিম ইত্যাদির উৎপাদনে অগ্রগণ্য হয় সত্বেও অপুষ্টিজনিত সমস্যা আমাদের অনেক।

এমনকি অপুষ্টির অভাব শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক। অল্প-বয়সী গ্রামের ছেলে-মেয়েরা, বিবাহিত মহিলারাও একই রকমভাবে পুষ্টির এভাবে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রোটিন ও পুষ্টির সুষম বিন্যাসের অভাবে শুধু যে বাড়বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে , কর্মক্ষমতা কমছে তাই নয়, বিশেষ চিন্তার কারণ এর ফলে নানান রকম অসুখ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপক অসামঞ্জস্যে মান সিক ও বৌদ্ধিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। সব স্কুলগুলিতে পুষ্টিবাগান গড়ে উঠুক। ছাত্রছাত্রীরা শিখুক কিভাবে সাধারণ শাকসবজি চাষ করতে হয়, তাদের গুনাগুন, পরিবেশের গুরুত্ব, মাটি ভালো রাখার উপায় জানলে নিজেদের পুষ্টির দিকটা নিজেরাই নজর দিতে আগ্রহী হবে এবং সুঅভ্যাস গড়ে উঠবে তাদের মধ্যে।

Alternate Medication for Managing High Blood Pressure

Satyabrata Maiti

Now-a-days, diagnosed with high BP (blood pressure) or hypertension as doctors may call it, are terrifying and termed as dangerous since doctors make you drug dependent for whole of life. They prescribe a medicine and after sometime it would not work and they will change another medicine and the story will go on. But I would like to give you a good news that once you learn and understand cause and nature about high blood pressure, you will be in a position to manage it with **proper diet** and a bit **lifestyle change** as well as **medication**, if necessary further. **Don't be afraid– educate and empower yourself.**

Defining and measuring Blood Pressure

When people say "taking your blood pressure," they mean measuring the force of the blood that your heart pumps through your body. Two figures are referred to as systolic and diastolic blood pressure, both figures are significant, but for different reasons.

Systolic

It is the pressure in your heart during a heartbeat and the number that is measured is called systolic blood pressure.

Diastolic

The heart takes a break between beats so it can get more blood. During this pause before the next heartbeat, the number that is recorded, is diastolic blood pressure.

For example, a blood pressure reading considered normal for most healthy adults is usually **below 120/80**, which is reported as "120 over 80." The systolic pressure is 120 and the diastolic pressure is 80. Children and teens may have slightly lower normal blood pressure.

Why Does It Matter If We Have High Blood Pressure?

Hypertension significantly increases the risk of heart, brain and kidney diseases, and is one of the top causes of death and disease throughout the world.

Nearly 63% of total deaths in India are due to non-communicable diseases, of which 27% are attributed to cardiovascular disease which affects 45% people in the 40-69 age group. Raised blood pressure is among the most important risk factors for CVDs. Moreover, it remains poorly controlled due to low awareness about hypertension, lack of appropriate care through primary care and poor follow up.

What Causes High Blood Pressure?

There are several things that come into play in increasing blood pressure. Genetic factors do not DIRECTLY CAUSE high blood pressure; they simply make us more likely to get high BP at some point. What is interesting here, is that some people may be more susceptible to certain things while other factors have virtually no effect on them. Age also makes a difference. As we age, our blood vessels tend to get less elastic, so that lifestyle factors affect us more. Factors of unhealthy lifestyle certainly contribute to high blood pressure, but they normally show up at middle age or beyond. These include: Smoking; Diet high in processed and starchy foods; Being obese or overweight; Alcohol consumption; Sedentary lifestyle; Sodium intake

Signs and Symptoms of High Blood Pressure

When blood pressure goes up over 180/100, it may cause hypertensive crisis which may be of two types: **Urgent** & **Emergency**

Signs and symptoms of a severe hypertensive crisis MAY include: Severe chest pain; Severe headache, accompanied by confusion and blurred vision Nausea and vomiting; Severe anxiety; Shortness of breath; Seizures; Unresponsiveness.Medical

complications of a hypertensive crisis can include stroke, and damage to the blood vessels.

Inflammation

Inflammation is one of the primary factors of most of the chronic diseases including: cancer, obesity, diabetes, Crohn's disease, heart disease, arthritis, and many more. Chronic inflammation is not a good thing. A diet high in sugar and processed foods can cause chronic inflammation in the blood vessels. Hypertension is associated with inflammation; however, whether inflammation is a cause or effect of hypertension is not well understood.

Salt/Sodium

For decades, doctors are speaking to avoid or minimise common salt in the diet, because it was generally considered a contributing factor in high blood pressure. Well, salt/sodium retains water in the body. When that happens, blood volume goes up slightly as well, with the result, some people develop higher blood pressure. That is why one of the first medical interventions involves a diuretic drug to help the body get rid of excess fluids. **However, well-run scientific studies have actually been inconclusive regarding the effects of salt on hypertension.**

The point is, there is NO ONE simple answer regarding salt and its effects on blood pressure, but it seems that dietary intake of junky processed food is most likely a big problem. Sodium intake (75-80%) by people in India is also going high due to high in processed food consumption. Only 10-15% of total dietary sodium comes from food cooked at home. Salt intake alone does not determine blood pressure; it is simply part of a complex equation.

Electrolytes found in your body include: Sodium; Potassium; Chloride; Calcium; Magnesium; Phosphate; Bicarbonate

Sodium and potassium balance each other. Too much sodium salt depletes potassium, and too much potassium depletes sodium. So, the important choice here is to increase potassium in the diet. And that is very easy—all you need to do is add lots of fresh vegetables and fruits in your diet.

Some of the food that contain the highest levels of potassium are as follows:

Avocado; Squash; Spinach and other dark green leafy vegetables; Sweet potatoes; Coconut water; Pomegranates; Bananas; Dried apricots

Interestingly, a diet too high in sodium usually means a diet that is too high in processed foods. But a diet high in potassium, means eating lots of fresh, whole, healthy, REAL foods that we want for many health reasons, including lower blood pressure.

Alcohol

Based on some of the research, the interaction between alcohol and health is rather misunderstood and controversial. However, the most recent findings about the association between alcohol drinking and high blood pressure show that it is 'dose-depended'. The higher the amount of alcohol consumed, the higher the rise in high blood pressure risk.

Coffee and Caffeine

Way back in 1934, coffee and caffeine were found to have an effect on blood pressure, so this is not a new topic.If you have high blood pressure, consult your doctor if you should limit your coffee drinking.

Stress

Stress is our natural **'fight or flight'** response that makes our hearts beat faster, our breathing increases, blood sugar is released in our system for easy access, and our peripheral blood vessels constrict. Stress can definitely cause high blood pressure, because when the peripheral (outlying) blood vessels constrict because of stress, the pressure inside the blood vessels increase.

Better stress relievers include healthy eating, hiking, running, cycling, camping, meditating, or yoga and, these not only help you to reduce high blood pressure but also good for your overall health.

Conventional Treatment for high BP

Although, high blood pressure used to be defined as 140/90, but most medical practitioners will recommend medication, even for borderline hypertension 130/80.

Blood pressure medicines are as follows:

Diuretics

These are some of the oldest and simplest blood pressure medicine. They simply help the kidneys flush excess fluids and sodium from the body by increasing urination, thereby lowering blood volume and blood pressure.

Side effects: frequent urination, mild dehydration and loss of potassium which can result in fatigue, weakness, leg cramps or even heart dysrhythmias. Thiazide diuretics also reduce beneficial HDL, increase triglycerides and total cholesterol, and increase insulin resistance.

A.C.E. Inhibitors

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitors block the hormone angiotensin that causes blood vessels to constrict.

Side effects: include a dry cough, fatigue, headache, skin rash, loss of taste, and increased potassium levels.

Beta Blockers

Slow down the heartbeat by blocking the excitatory 'fight or flight' hormones adrenaline and noradrenaline in the nervous system. Beta blockers relax blood vessels and help to restrict production of angiotensin.

Side effects: include cold hands and feet, fatigue, weakness, sleep disturbance, depression and constipation.

Calcium Channel Blockers

Calcium in the cells creates an electrical current that conduct signals for the muscles, heart and blood vessels to contract. Calcium channel blockers decrease the force of the heart's contraction and increase blood vessel dilation.

Side effects: include headache, constipation, rash, nausea, flushing, edema, depression, dizziness and possible liver enzyme abnormalities.

Many of these medications are used in combination with other blood pressure medications, so the list of side effects may be compounded.

As is the case with many pharmaceutical interventions, medications tend to only treat the symptoms, but not the underlying cause of the disease. According to a report of University of Florida study, using drugs to lower blood pressure can shorten your lifespan instead of extending it.

According to another new study published in the American Heart Association's journal "Hypertension". ***The researchers found that people who were taking beta-blockers and calcium antagonists were twice as likely to be admitted to a hospital for mood disorders, compared with patients on angiotensin antagonists or ACE inhibitors.***

Natural Ways to Lower Blood Pressure

There are many natural ways to lower blood pressure, including lifestyle changes, dietary changes, exercise and stress reduction. On top of those things, the **best way to address blood pressure issues** is to add in some **healthy supplements** that help to relax the blood vessels, increase nitric oxide in the blood—which opens and relaxes blood vessels, and supplements that decrease inflammatory factors. Supplements that do not burden your pocket and add to your good health are:

Magnesium:

Numerous scientific studies have shown a direct physiological link between low magnesium levels and hypertension in humans and other animals.

Inside each of our cells, there is what is called a sodium/potassium pump. This pump regulates fluid inside and outside of our cells and is important to maintaining proper fluids. Magnesium is an essential element in this pump system, so reducing sodium, and increasing potassium and magnesium intake can directly improve the source of the problem and ***should really be the first line of defence for any person with elevated blood pressure.***

Best aupplements available in the market is magnesium glycinate or magnesium malate as they are easier on the digestive system and have easily assimilated in the body.

Caution: *Be aware, that magnesium is a laxative. The above forms of magnesium will help you steer away from this issue. Avoid magnesium citrate, it has the MOST laxative effect.*

Potassium:

A healthy diet will supply most all of the potassium necessary for optimal health. I fact, if you are eating a diet high in vegetables and fruit you won't need to take a potassium supplement. Fruits and vegetables are reach in potassium.

Curcumin:

Curcumin, the active ingredient in turmeric, has been acclaimed as one of the most powerful anti-inflammatory natural supplements. Many studies have shown that curcumin is highly protective for the heart and blood vessels, helping to reduce the incidence of heart attacks and reducing blood pressure. However, intake of curcumin alone will not help it has to be taken with bio-piperine (readily available in black pepper).

Curcumin exerts a strong antioxidant effect that not only reduces blood pressure but reduces harmful cholesterol levels and prevents age-related changes in blood vessels, such as stiffening.

Caution: *Women who are pregnant should avoid turmeric due to the possibility of uterine stimulation. There is insufficient information for women who are nursing, so contact your doctor before taking it.*

Omega 3's:

Omega 3 fatty acids have been found to reduce blood pressure as effectively as other lifestyle changes including exercise, sodium reduction, and alcohol limitation (American Journal of Hypertension).

Omega-3 fatty acids also support brain function, including memory, reduce inflammation, and enhance cardiovascular health.

Omega 3 fats can come be sourced from plants or animals, like fish or krill. However, long chain omega 3 fatty acids from fish or krill are put directly to work in the body, crossing the blood-brain barrier, and go to work in your cells, which is where they need to be. Even vegetarians must be aware of this fact and if they want to get the health benefits from omega 3 fatty acids, the omega 3 must come from animal sources.

Vitamin B complex:

B vitamins are vital to our physical and mental health and they actually help us feel less stressed and anxious. Relaxation is vital to normal levels of blood pressure. Studies have shown B vitamins to play a positive role when it comes to lowering blood pressure and preventing strokes.

B vitamins consist of thiamin or B1, riboflavin or B2, niacin or B3, pantothenic acid or B5, pyridoxine B6, biotin B7, folic acid B9 and cobalamin B12.

Vitamin D:

If you are deficient in vitamin D, you are more likely to have higher blood pressure. Vitamin D supplementation can reduce blood pressure in people with hypertension.

Caution: It is highly recommended that patients have their vitamin D levels checked by a physician or lab on a regular basis for the proper levels. Too little or too much vitamin D can be detrimental.

Necessary Dietary Changes to Lower Blood Pressure

An important key to success of reducing blood pressure is by eliminating wheat and corn products from the diet. While this may appear a bit surprise and unorthodox, it is probably one of the most important dietary strategies one can make towards lowering blood pressure. Total elimination if not possible, drastically reduction of all wheat and corn products including whole grain breads, pastas, breakfast cereals and bars, bagels, muffins, crackers, pancakes, cookies, tortillas, chips, and foods containing corn starch, or high fructose corn syrup would be one of the most powerful components of lifestyle modifications of reducing high blood pressure.

Some of the best REAL foods to help lower blood pressure include: raw, unsalted nuts such as almonds, pecans, walnuts, Brazil nuts, pistachios and hazelnuts. Pumpkin and sunflower seeds are also powerful additions to the diet. Be sure to include lots of brightly coloured organic vegetables such as dark green leafy vegetables, brightly coloured peppers, tomatoes, squash, red onions, watermelon, berries and more. Use healthy unprocessed oils such as virgin coconut oil, extra virgin olive oil, virgin mustard oil and avocado oil.

Top 5 Foods as Effective as Medicine

Beets

Especially red beets, have been found to contain a large amount of nitric oxide. Nitric oxide causes blood vessels to relax and open up, lowering blood pressure and helping the body carry more oxygen to parts of the body where it is needed namely muscles, heart and brain.

Watermelon

Watermelon is a highly effective blood pressure reducer. Watermelon contains lycopene, which is a powerful anti-inflammatory and antioxidant, known as protective the cardiovascular system, bone health, and preventing cancer. In addition, it also prevents UV damage from the sun.

Watermelon also contains another powerful phytochemical, citrulline, which is an amino acid. It is present in the white part of watermelon which is converted into arginine, or L-arginine. Arginine helps our bodies create nitric oxide which helps in lowering blood pressure.

Garlic

Garlic is simply a remarkable food for so many reasons. It contains sulphur compounds, amino acids, powerful antioxidants, vitamins and minerals. And, it also

contains allicin which is one of the primary ingredients in garlic that helps in reducing blood pressure and prevent heart disease.

Note: If you are taking a blood thinner or ACE inhibitor for blood pressure, be sure to consult your physician before beginning garlic supplements

Pomegranate Juice

Pomegranate juice is a powerhouse of antioxidant with anti- inflammatory and anti-cancer fighting abilities. It is another healthy food that has true medicinal qualities, without the negative side effects that most of the medicines do have.

Pomegranates can help prevent or treat various health problems including high blood pressure, high cholesterol, oxidative stress, high blood sugar, and other health problems related to inflammation. Pomegranates contains very powerful polyphenols that have very strong antioxidant, anti- inflammatory abilities. Pomegranate juice can also reduce oxidative stress, free radicals, and lipid peroxidation.

Green Tea:

Green tea contains many powerful polyphenol antioxidants that have health-protective benefits. It also contains powerful flavonoids, EGCG which is responsible to counteract a variety of diseases. It helps in preventing arteriosclerosis, blood clots, heart attack, and strokes—partly due to its ability to relax blood vessels and improve blood flow.

Adding a bit of lemon juice in green tea can boost the amounts of antioxidants that our body can absorb. In fact, citrus can increase antioxidant levels by more than five times.

In addition, green tea is also packed with vitamins A, D, E, C, B, B5, H, and K, manganese, and other beneficial minerals such as zinc, chromium, and selenium.

Important Lifestyle Modifications to Lower Blood Pressure

Exercise

Exercise is highly effective in lowering blood pressure, even in case of "resistant hypertension", which means the patient is on 3 or more medications to lower it.

Brisk walking for a half hour or more 3-5 times a week will go a long way towards lowering blood pressure.

Meditation

Meditation is a calming way to increase serotonin, slow down the heart rate, inducing positive thoughts and lower blood pressure. But meditation alone will not help. However, mediation in combination with other positive lifestyle changes can help.

Conclusion

High blood pressure and diagnosed hypertension remain a risk factor for heart disease and strokes and can have very serious consequences if left unchecked.

Following necessary lifestyle changes, dietary changes and adding specific foods and supplements can help to reduce blood pressure to healthy levels, possibly without medical intervention.

A Day Exploring the Ancient Persian City of Persepolis

K K Satpathy

Iran undoubtedly is home to one of the oldest ancient civilization and a powerful empire in the world for centuries. Travelling to Iran without visiting Persepolis may be considered a huge skip of history. I visited Persepolis and the neighbouring archaeological sites on a day trip while travelling from Shiraz to Yazd during my tour across Iran in April, 2022.I reached Shiraz which is also a historic city and important tourist centre in Iran from the capital city of Teheran by flight. We were 12 persons traveling on a group tour from Kolkata. Persepolis is located on the hillside of Rahamat Mountains, 60 km north east of the city of Shiraz. From Shiraz, we travelled through a four-lane highway in a barren hilly terrain reaching our destination in about one and half hour. Persepolis also known as *Takht-e-Jamshed*, contains imposing remains of many ancient buildings and is among the world's greatest archaeological sites. It exists as maze of stone columns, colossal structures of beautiful designs and bas reliefs that tell us a story of the once powerful Persian empire of antiquity.

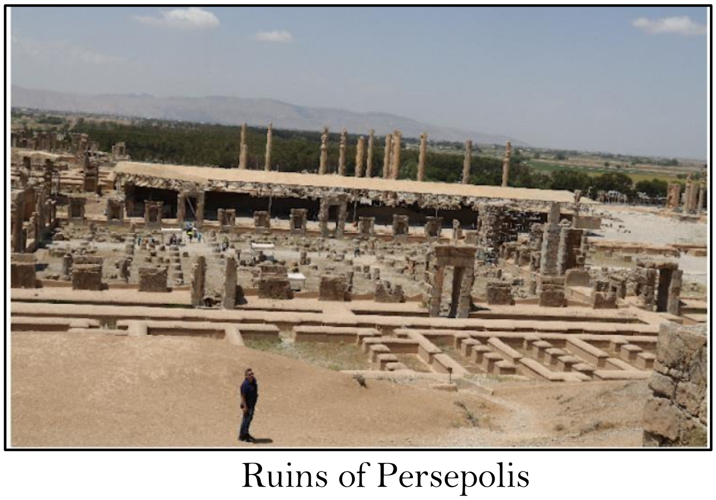

Ruins of Persepolis

The mighty Persian Empire was one of the largest dynasties in ancient history. It was huge and at its peak extended vast masses of land spanning from the Balkans in

Eastern Europe to the Indus valley in modern day Pakistan. Under the rule of the Achaemenids founded by Cyrus the great in the sixth century BC, the empire increased its power quickly and became one of the largest kingdoms to have existed on planet earth with amazing riches. The Achaemenid Empire became well known for its developed civilization, culture, successful foreign policy until it was conquered by Alexander the great two centuries later. It was this time that the religion of Zoroastrianism was born, which was used to be the state religion of the great Achaemenid kings. Persepolis was the ceremonial capital of the Achaemenid Empire. Persepolis is the Greek name for Persian city but the Persian knew it as the city of Parsha which is also the word for the region of Persia.

Grand staircase

Construction of this capital is believed to have been started by king Darius-1 who wanted to replace Pasargadae (40 km away), earlier capital. It was planned and executed by persons brought from Greece, Egypt, Babylon and other places then under Persian Empire. It, however, took more than a century before it was finally completed. However, built in a remote region making travel difficult in rainy season, Persepolis was an inconvenient location for the residence of the rulers of the empire. The collection of palaces in the small city was mainly used to hold royal ceremonies, festivities and receptions. It was, however, home to mighty gates, colonial buildings, ornate places, majestic throne hall, exquisite living quarters and beautiful tombs. Persepolis stood in the glory of two hundred years before it was destroyed in 330 BC. Historians believe that after invading Persia that year, Alexander, the great set his armies against Persepolis and plundered the city and destroyed it. At about 1000 AD, Arab Muslims attacked Persia and changed everything including alphabet.The city gradually declined and forgotten until

1931 when the ruins were excavated by university of Chicago sponsored archaeological expedition. Some of its artefacts have been shifted to museum across the western world but the ruins of Persepolis still remain the most impressive Achaemenid architecture. Now in ruins,it was pretty amazing to walk around and imagine how gorgeous it would have looked in 4th century.

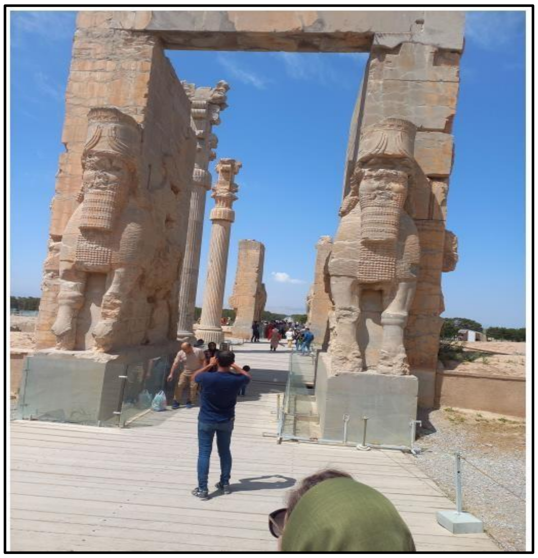

Gate of all nations

The UNESCO world heritage site of Persepolis houses well preserved sculptures, stone carvings including ancient scripts as well as palaces and mausoleum of some of the greatest Achaemenid rulers. The complexes of Persepolis are raised high on a walled platform built on half artificial half natural terrace with number of palaces or halls of varying sizes and grand entrances inspired by Mesopotamian models.To reach the terrace, one has to walk the grand staircase. The identical stairways leading to the palace have 111 steps each in two flights meeting at the gates of all nations. One stairway was used by the delegations from the subject nations from far flung kingdoms bearing gifts while the other was used by the nobles of the empire to express their loyalty to the kings.

Apadana palace

Visitors of Persepolis were welcomed by the gate of all nations containing many depictions from all the diverse lands across Asia, Europe and North Africa, the Achaemenid Empire used to rule over. There are quite a few Greek and Roman type columns with variety of statues at the top. The most famous structure and impressive palace building was 'Apadana', the roof of which is held up by 72 columns of 25 meters height each covering an area of over 1000 square meter. The hall could contain hundreds and thousands of people at the sametime. The impressively decorated columns with animal figures give visitor a taste of the former glory of the grand palace which was used for royal receptions. The throne hall with 100 columns is the second largest structure which served as the imperial army's hall of honour. It was used for official receptions and gatherings of provincial representatives. The hall once stood with towering wooden pillars but only evidence of them which remains at present in the stone bases. The imperial treasury is located in the south eastern corner of the site.The treasury restores the booty of the conquered tribes and the annual tribes from the king's loyal subjects. When Alexander looted the treasury, he needed 5000 camels and 2000 mules to carry the vast treasures.

Throne hall

A short walk up the hill behind the ruins of Persepolis, one can find a small collection imperial rock cut tombs, mausolea believed to be the final resting palace of kings. Plenty of well-preserved inscriptions and stone carvings were discovered in the place. Most inscriptions were written in multiple languages including Old Persian. There are lot of pictures engraved on the walls on themes from different places like Greek, Roman, Babylon, Egypt, Turkey, Afghanistan and even India. The inscriptions often read praise to the rulers or practical notes from ancient times while the stone carvings illustrate historical events as well as plants and animals. So far around 30000 inscriptions have been found from the exploration of Persepolis which offer an insight into its function and the lives of the people who lived and worked there. One can spend hours and hours gazing up at the facade and reliefs carved into the rock – it is a pretty awe inspiring site.

Inscriptions and carvings

About 12km northwest of Persepolis is where the Necropolis locally known as *Naqs-e- Rustam* stood. Necropolis house four ancient tombs carved high on a rocky mountain believed belong to four Archimedean kings, who ruled Persia for a period of total 114 years after Cyrus the great, the founder. The bottom part of the cliff are rock reliefs containing carving from Sassanian era that ruled Persia a few centuries after the fall of Archimedean Empire and beyond. Each tomb has an entrance leading to a small chamber where the king was buried. Although each of these tombs has door like openings to the inner part of the structure, archeologists believe that these doors weresmashed and the tombs were looted as soon as Alexander managed to overthrow the once powerful Achaemenid Empire. Nearby, there is aZoroastrian fire temple.

Necropolis

Next, we proceeded for Pasargadae, the first capital of Achaemenid Empire under its founder Cyrus the great located 40 km to the northeast of Persepolis. On the way, after half an hour drive through adesert type of environment, we reached a place with few houses. We entered a restaurant for lunch. As in other places in Iran, the portion (food) size of each person was quite big with one large size chicken (whole) for three persons and no vegetable. We reached Pasargadae after short drive this world heritage site includes remaining structures of the tomb of Cyrus, gardens, palaces and other structures. The Tomb (now renovated) survived over 2500 years while the city around it has crumbled. According to various narrations, Cyrus himself ordered the construction of his tomb during his reign in 6^{th} century. The tomb structurally consists of two distinct elements: a high platform with six steps and a tomb chamber on the top with gableroof. The total height of the monument is about 11 meters. The rectangular platform is composed of two visually distinct portions: the lower three steps, each measure about one-meter height, while the upper three steps are just about that height. The interesting point about the architecture of the building is that no mortar was used in its construction. During the mediaeval period, the monument was thought to be the tomb of King Solomon’s mother and so it became a sacred place and Islamic pilgrimage center.

Tomb of Cyrus, the great

With Pasargadae, our tour of Persepolis was over. In 1971, Persepolis was the main staging ground for the 2500-year celebration of the Persian Empire. It included delegations from foreign nationals inan attempt to advance Iranian culture and history. Being average travellers and not history buffs, we were immensely enriched by the excellent and detailed explanation about the relics, history, and archaeology of this ancient site by our knowledgeable Iranian guide. There is lot of misconception in India about security situation in Iran. Far from feelingintimidated or unsafe, we were greeted by friendly open mindedness by Iranians everywhere we went. Following the visit, we proceeded for Yazd, another historical city from where the bulk of the Persis in India migrated due to religious persecution.

Scotland – Places to Visit

Reena Datta and Mrinmoy Datta

While mentioning about our vist to Scotland , the name which glares in our mind is Rev. Alexander Duff who was the First Missionary from Church of Scotland and established Scottish Church College in 1830 and later the present name of the College came into being in the year of 1929.The Royal College of Surgeons in the city of Edinburgh in Scotland is illustrious along with the coveted degree of 'FRCS' being milestone in the domain of Medical Education Worldwide. Whisky, the story of this famous National Drink dates back more than 500 years , is one of Scotland's greatest export with around 41 bottles of Scotch being shipped around the World every second . The name ' Scotland Yard' is iconic and widely recognised as the Symbol of London Police Force.

We started from London and came to Edinburgh, Capital City of Scotland after 6 hours of beautiful journey covering pictersque places in the way.

Edinburgh Station in Scotland

Edinburgh Castle is one the oldest fortified places in Europe.With a long rich history as a royal residence, military garrison, prisonsand fortress, it is alive with many existing tales. While climbing castle Hill, one can feel the footsteps of soldiers, Kings and Queens and even the odd pirates. Though parts of it remain in military use, the castle is now a World –famous visitor attraction. It is also an iconic part of Old and Newtown's of Edinburgh, World Heritage site. The Castle had suffered many sieges. Scots took over the Castle from the English under the leadership of Thomas Randolph, Nephew of famous Robert-the Bruce. Military barracks were built housing 600 troops during Napoleonic wars in France. Iconic Crown made of gold,diamond and precious stones are kept over there.

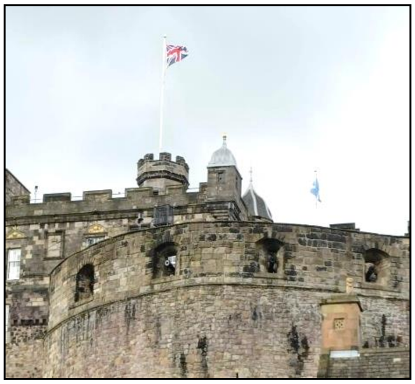
Edinburgh Castle

Iconic Crown/Sword/Sceptre

During summer in the month of July, visitors across the World mainly from Europe pay visit Scotland, mainly Edinburgh, to see the places around. Buildings are old and kept like this just toshow the ancient Culture of the place.

Old Town of Edinburgh

Large no of Visitors

The wonders of Art, Natural History, Science discovery, various design are housed in National Museum of Scotland, situated in Edinburgh. It is a 3 storey building having all sorts of display having details of adventure planet, Nature, Stylish living, dedicated potters, Engineering humans,3D printing, Machines and locomotives, Designing and making fashion, Rethinking discoveries and collecting stories *etc*. Strikingly a photograph mentioning in Bengali, Palli Phone(Village Phone) was seen inside the Museum indicating possibility of connectivity in Rural Bengal during time of Nawab Sirajudulla.

National Museum

Skeleton of Dinosaurs

Palli Phone (Village connectivity)

Discovery of Locomotive

Edinburgh is famous for its Royal College of Surgeons being established 518 years ago in 1505 by King James IV. It is the oldest and prestigious Surgical Corporations offering members and fellows across the World in various disciplines, such as Surgery, Dentistry, Preoperative Care, and pre hospital care, remote and rural and humanitarian healthcare. This College offers Fellow 'FRCS' being recognized as the best Medical Education in the World.

Royal College of Surgeons

Surgeons in Pictorial Position

Performing Human Dissection

Scotland is the most mountainous country in the United Kingdom. Scotland's mountain ranges can be divided in a roughly north to South directions. Ben Nevis is the highest mountain over 4000 ft. in Scotland and hundreds of thousands of people visit Highlands inScotland particularly in winter. Glencoe is a village in Western Scotland and it lies in steep sided valley in Scottish Highlands. Loch Ness is a large fresh water loch in the Scottish Highlands extendingfor about 37 kms. It takes its name from the River Ness, which flows from Northern end. Its deepest point is 230 m and water temperature drops to 5^0 C in winter.

Parliament Estate in India is not open for normal visitors. However, one can visit Parliament after obtaining entry pass from Strict Security Establishment. But unlike Indian Parliament, Parliament in Edinburgh is open to all. Trams in Edinburgh operated from 1871 are still observed in the heart of the New City whereas in Kolkata, Trams , introduced in 1873 are almost withdrawn having only 6 active tram routes as in 2023.

Scottish Parliament

Scotland Trams

Scotland is a warm and hospitable country indeed. The stunning archipelago is famous not only for its outstanding natural beauty, but also its delicious food and long history of whisky production. People here want to make you feel at home and one will find enthusiastic friendliness through exchange of smiles. We had a memorable visit to Scotland.

নেপাল ভ্রমণ - আনন্দময় আটদিন

বিনয় কুমার সাহা

তারিখ ১৮.০৪.২০২৩ মহাযোগী গোরক্ষনাথ বিমানবন্দর গোরখপুরে বিমান যখন ভূমি স্পর্শ করল তখন বিকেল ৫টা। এই বিমানবন্দরটা খুবই ছোট এর পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয় বিমানবাহিনীর হাতে এবং আমাদের ফ্লাইট ছিল Indigo 6E-7174 ATR ৭২ সিটার।

এই ভ্রমণে আমাদের ARICARE থেকে ৬ জন সদস্য ও তার পরিবার ১২ জন এবং আর একটা পরিবার ২ জন অর্থাৎ ১৪ জন ছিলাম। এবার আমাদের প্যাকেজ ভ্রমণ ছিল মে : পরিচয় ট্যুর ও হলিডেজ এর সাথে তবে আমাদের সাথে কোন ট্যুর ম্যানেজার ছিল না। কিন্তু সবরকম বন্দোবস্ত ছিল এবং আমাদের টিম ম্যানেজার হিসেবে ডঃ মিসেস শ্যামলী চক্রবর্তী কে বেছে নিয়েছিলাম উনিই পুরো ভ্রমণের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে গিয়েছিলেন। যাইহোক বিমানবন্দরের বাইরে আমাদের জন্য দুইটি ইনোভা রাখা ছিল। যথারীতি সব মালপত্র গাড়ির ছাদে বাঁধাবাঁধি করতে সন্ধ্যা ৬টা হয়ে গেল। গাড়ি ছুটতে শুরু করল, রাস্তা অবশ্য খুব ভালো ছিল না এবং জ্যামও ছিল তারপর একটা ধাবায় চা ও স্নাক্স এর বিরতি, এইভাবে চলতে চলতে আমরা রাত দশটায় সোনাউলী বর্ডার , ইন্দো - নেপাল বর্ডারে গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু ওখানে পৌঁছে আমরা একটু অসুবিধায় পড়লাম, দশটায় বর্ডারের গেট বন্ধ হয়ে যায় তাই কোনরকমে আমরা বর্ডারটা পাস করে নেপালে গিয়ে অপেক্ষা করতে হল কেননা আমাদের যে বাসটা দেওয়ার কথা ছিল তখন সেখানে ছিলোনা এবং আমাদের কাছে নেপালের সিম ছিলোনা যে ড্রাইভের কে ফোন করব কিন্তু ওদের বর্ডার সিকিউরিটি অফিসার আমাদের খুব সাহায্য করেছে এবং ড্রাইভারকে ফোন করে আমাদের পৌঁছনোর খবরটা জানায়। যথারীতি বাস যখন আসে তখন রাত ১১টা। সেখান থেকে অবশ্য আমাদের জন্য ১৭ সিটের এসি বাস ছিল এবং সবাই যে যার মালপত্র গুছিয়ে হোটেল মৌরিয়া , লুম্বিনি তে পৌঁছলাম এবং ডিনার করেই যে যার ঘরে চলে গেলাম। এইভাবেই একটা রাত কেটে গেল।

দ্বিতীয় দিন ১৯.০৪.২০২৩ সকাল ৯.৩০ ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম লুম্বিনির দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে। প্রথমে আমরা পৌঁছলাম নেপালের রূপানদেহি জেলায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। আনুমানিক ৫৬৭-৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সুত্তা নিপোতায় বলা হয়েছে - শাক্যদের একটি গ্রাম লুম্বিনিয়া জনপদে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। হিন্দু বর্ণ অনুসারে, শাক্যরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। বৌদ্ধ পুরাণ অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধের মা মায়াদেবী শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তু থেকে তার পৈতৃক বাসগৃহে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে লুম্বিনী গ্রামের একটি উদ্যানের ভিতর, একটি শালগাছের নিচে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের আগে তাঁর মা মায়াদেবী এখানে একটি দীঘিতে স্নান করেন। গৌতমের জন্মের পর তাঁকেও এই দীঘিতে স্নান করানো হয়। এই কারণে এই জলাশয়টিকে পবিত্র পুস্করিণী মান্য করা হয়। লুম্বিনিতে পরে মায়াদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্দিরের একটি স্থানকে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কালক্রমে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অযত্নের ফলে এই মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান, লুম্বিনী

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার সম্রাট অশোক ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এই তীর্থভূমি পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি এই গ্রামের প্রজাদের রাজস্ব এক-অষ্টমাংশ হ্রাস করেছিলেন। তিনি অশোকের আগমনের স্মারক হিসেবে এখানে একটি অশোক স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অশোক স্তম্ভকে কেন্দ্র করেই এই ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্থানটি পুনরাবিষ্কার করা হয়। ষষ্ট শতকে বিখ্যাত বিখ্যাত চীনা সন্ন্যাসী ও পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শনের সময় কপিলাবস্তু ও লুম্বিনিতে আসেন। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত ভ্রমণকাহিনিতে সম্রাট অশোকের স্মারক স্তম্ভের বর্ণনা দেন এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান হিসেবে লুম্বিনির উল্লেখ করেন। এই স্তম্ভটি তৈরি করা হয়েছিল একটি অখণ্ড পাথর দিয়ে। এর শীর্ষভাগে ছিল অশ্বমুর্তি। তবে এই অশ্বমুর্তিটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো কোনো এক সময়ে ।

এছাড়া এখানে লুম্বিনী ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট নাম একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো লুম্বিনীকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লুম্বিনিতে ৪ ঘন্টা মতো সময় কাটিয়ে দুপুরের খাওয়া একটা হোটেলে সেরে নিলাম তারপর গাড়ি চিতোয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। চিতোয়ানে পৌঁছতে মোটামুটি চার ঘন্টা লাগল। রাট আটটায় আমরা এডভেঞ্চার সাফারি রিসোর্টে পৌঁছলাম। এখানে আমাদের জন্য দুই রাত সাতটি কামরা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এখানেও যথারীতি ডিনার সেরে যে যার ঘরে চলে গেলাম। এখানে দুই রাত কেটে গেল।

তারিখ ২০.০৪.২০২৩ সকাল ছয়টায় দুটি সাফারী গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো বুড়ি রাপ্তী নদীতে বোটিংয়ের উদ্দেশ্যে। এখানকার বোটগুলো একটা কাঠের গুড়ি দিয়ে তৈরি। একটা বটেই আমাদের ১৪জনকে নিয়ে মাঝি রাপ্তী নদীটা ঘুরিয়ে পাড়ে এনে নামাল। নদীতে একটা ঘড়িয়ালের দেখা মিলল ও তাদের বাসস্থান দেখলাম।

বুড়ি রাপ্তী নদীতে বোটিং

এরপর হাতি প্রজনন কেন্দ্র ও মিউজিয়াম ঘুরে হোটেলে ফিরে সোজা ডাইনিং হলে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। দুপুর দুইটায় আবার দ্বিতীয় স্টেপ তাই সবাই স্নান সেরে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলাম। দুপুর দুইটায় যথারীতি আমাদের বাহন সাফারী জিপ এসে হাজির। এবার গন্তব্য চিতোয়ান ন্যাশনাল পার্কে সাফারি অভিযান। ফরেস্টের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে অনেক কিছুর দেখা মিলল যেমন হাতি, ময়ূর, কচ্ছপ, গন্ডার, বিদেশি পাখি ।

ফরেস্টে ৩ ঘন্টা কাটিয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা সাতটায় হোটেল ম্যানেজার আমাদের জন্য ট্রাইবাল নাচের বন্দোবস্ত করেছিল। নাচ শেষে ডিনার করে আবার যে যার ঘরে চলে গেলাম। তিন রাত কেটে গেল, পরের দিনের জন্য আবার তৈরি।

চিতোয়ান ন্যাশনাল পার্ক

তারিখ ২১.০৪.২০২৩ সকাল ৯.০০ টা। ব্রেকফাস্ট সেরে যে যার মালপত্র গাড়িতে তুললাম নেক্সট ডেস্টিনেশন পোখরার উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে আমরা মনোকামনা মন্দিরটা দর্শন করে নিলাম। এখানে রোপওয়ে করে মায়ের মন্দিরে যেতে হয় এবং এক ঘন্টা লাইন দিয়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলাম।

নেপালের গোর্খা জেলায় অবস্থিত মনোকামনা মন্দির হিন্দু ধর্মের একটি অন্যতম শক্তিপীঠ বলে গণ্য করা হয়। মনের অভিষ্ঠ কামনা পূর্ণ করেন এই অভিমতের প্রেক্ষিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনোকামনা রাখা হয়েছে। রাম শাহের রাণী স্বয়ং মনোকামনা দেবীর অবতার ছিলেন বলে জনবিশ্বাস আছে। দশহরায় দেবীর পূজার জন্য প্রচুর ভক্তসমাগম ঘটে। এখানে প্রতি অষ্টমী তিথিতে বলিদানের রীতি আছে। মনোকামনা দেবীর দর্শনে মনের সকল আকাঙ্খা পূর্ণ হয় এমন ধর্মীয় বিশ্বাস আছে।

মাতা মনোকামনা মন্দির

মন্দির দর্শনের পর গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করল। মাঝে অবশ্য একটা হোটেলে লাঞ্চ সেরে নিলাম। রাত আটটায় আমরা হোটেল হোয়াইট পারলশ পোখরায় এসে পৌঁছলাম। এটা বলে রাখি নেপালের সব রাস্তা খুব খারাপ। হাইওয়ের জন্য সব রাস্তা ভেঙে আবার তৈরি হচ্ছে। সবাই খুব বিধস্ত ছিলাম তাই একটু ফ্রেস হয়ে ডিনারটা সেরে নিলাম ও তারপর যে যার ঘরে চলে গেলাম। চার রাত কেটে গেল। এখানে ও দুই রাত বুকিং ছিল।

তারিখ ২২.০৪.২০২৩ সকাল ৯.৩০ মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য। প্রথমে শান্তিস্তূপা বিন্দুবাসিনী মন্দির। এখানে প্রায় ৫০০ সিঁড়ি নামতে হয় এখানে অনেকেই নামতে পারেননি তবে আমি ও আমার স্ত্রী পুরোটাই নেমেছিলাম। তারপর ডেভিস ফলস দেখে একটা পাঞ্জাবি হোটেলে লাঞ্চ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

এক ঘন্টা রেস্ট নিয়ে বিকেল ৪.০০টায় ফেওয়া লেকে বোটিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। লেকটা অবশ্য হোটেলের কাছেই ছিল তাই সবাই পায়ে হেঁটেই পৌঁছলাম। আমাদের সাথে গাইড ছিল তাই টিকিট কাটার দায়িত্ব তাহার ই ছিল। এখানে এক ঘন্টা সময় ছিল এবং লেকের মধ্যিখানে তাল বরাহী মন্দির দেখে ফিরতে হয়। এখানে আরও একটা দেখার জিনিস ছিল সন্ধ্যা আরতি। সন্ধ্যা ৭.০০ থেকে ৮.০০, তাই লেকের পারে যে যার চেয়ার দখল করে বসে পড়লাম। আরতির শেষে আমরা হোটেল ফিরে ডিনার করে যে যার ঘরে ফিরে গেলাম। পাঁচ রাত কেটে গেল।

ফেওয়া লেকে সন্ধ্যা আরতি

তারিখ ২৩.০৪.২০২৩, সকাল ৯.০০ ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্টের জন্য একত্রিত হলাম তখন ওখানকার স্টেশন ম্যানেজার হঠাৎ আমাদের জানালেন বাস দুপুর ২.০০ পরে ছাড়বে কেননা চিতোয়ানে ভোট হচ্ছে তাই ওখানে বন্ধ, পাঁচটার পর খুলবে। হোটেলের চেক আউট হচ্ছে ১২.০০ টা অগত্যা হোটেলের রুম ছেড়ে লনে এসে মিলিত হলাম এবং দুপুর ২ টার পর বাস ছাড়ল। পরের ডেস্টিনেশন কাঠমান্ডু। প্রায় ৭ থেকে ৮ ঘন্টা লাগে

কাঠমান্ডু। আমরা যখন কাঠমান্ডু হোটেল (হোটেল আর্টিস) পৌঁছলাম তখন রাত ১১.০০। যাইহোক কপাল ভালো তাই গরম খাবার একটু জুটল। রাতটুকু থাকার জন্য কেননা পরের দিনই আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে নাগেরকোট।

তারিখ ২৪.০৪.২০২৩ সকাল ৯.০০ ব্রেকফাস্ট করে হোটেল চেক আউট করে মালপত্র নিয়ে বসে উঠে পড়লাম। কেননা পশুপতিনাথ মন্দির ও ভক্তপুরে দরবার স্কোয়ার দেখে নাগেরকোট পৌঁছতে হবে ওখানে একদিনের জন্য হোটেল বুক আছে। প্রথম আমরা পশুপতিনাথ মন্দিরে পান্ডা ধরে পুজো দিলাম।

পশুপতিনাথ মন্দির, কাঠমান্ডু

তারপর বৌদ্ধ স্তুপের সামনে প্রচুর পায়রার সমাবেশ আনন্দে সবাই সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এরপর বৌদ্ধ স্তূপায় কিছু সময় কাটিয়ে চলে এলাম ঘুমন্ত বিষ্ণু জলনারায়ণ মন্দিরে। এরপর আমাদের গন্তব্য ভক্তপুরে, ওখানে দরবার স্কয়ার।

ঘুমন্ত বিষ্ণু জলনারায়ণ, কাঠমান্ডু

ভক্তপুর এর দর্শনীয় স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে - ন্যায়তোলা মন্দির । পশ্চিম তামুধি তোল গেট , পটার্স স্কোয়ার , পটার্স স্কোয়ারের সিংহদ্বার , তামাদি তোল , ভৈরবনাথ মন্দির , তিল মহাদেব নারায়ণ মন্দির , দরবার স্কোয়ার , এরোটিক এলিফান্টস মন্দির, উগরাচান্দি এবং ভৈরব মূর্তি , রাজা ভূপতিন্দ্র মাল্লার কলাম, ভত্সলা দূর্গা মন্দির এবং তেলিজু ঘন্টা, রাজভবন, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি , সোনালী গেট, চায়াসিলিন মণ্ডপ, সিদ্ধি লক্ষী মন্দির, ফাসিদেগা মন্দির, তাধুনচেন বাহাল, তাচুপাল তোল, দত্তনারায়ণ মন্দির, ভীমসেন মন্দির, তাচুপাল জাদুঘর ইত্যাদি। দরবার স্কয়ারে ঘন্টা তিনেক থাকার পর সবাই কিছু না কিছু মার্কেটিংও সেরে নিল। বিকেল ৬.০০ আমাদের বাস নাগরাকোটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মাঝে একটু চায়ের বিরতি। সন্ধ্যা ৭.০০ আমরা হোটেল হিমালয়ান ভিলাতে এসে পৌঁছলাম। এখানে আসতেই একটু ঠান্ডার আমেজ অনুভব করলাম। সবাই যে যার শীতবস্ত্র এনেছিল সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে নিল। হোটেলে ঢুকতেই গরম চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন হলো। যথারীতি ৮ টায় ডিনার সেরে সবাই ঘরে চলে গেলাম কেননা পরেরদিন ভোর ৫.৩০ উঠে সূর্যোদয় দেখতে হবে। সাতদিন কেটে গেল।

তারিখ ২৫.০৪.২০২৩, সকাল ৫.৩০ এর মধ্যে সবাই হোটেলের ছাদে এসে উপস্থিত হলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য আকাশে মেঘ থাকাতে সানরাইজ আর দেখা হলো না। আজ আটদিন, আজ আমাদের ঘরে ফেরার পালা। সকাল ৯ টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট করে , হোটেলের চেক আউট নিয়ম শেষ করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ১১.৩০ এর মধ্যে আমরা বিভূতি অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর, নেপালে প্রবেশ করলাম। বিমানবন্দরের যাবতীয় নিয়মকানুন সেরে আমরা ফ্লাইটে গিয়ে বসলাম। আমাদের এয়ার ইন্ডিয়ার এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট AI-248 ছিল দুপুর ২.৩০ এ কিন্তু ওয়েদার খারাপের জন্য ৩০ মি: দেরিতে ছাড়ে এবং বিকেল ৪.০০ কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছোয়। আটদিনের অনেক স্মৃতি বহন করে বিকাল ৬টায় বাড়ি পৌঁছলাম।

কেনিয়া ভ্রমণের কিছু কথা

উৎপলা পার্থসারথি

কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ অফ নেশন্সের সদস্য। কেনিয়া মালভুমি ও উঁচু পর্বতে পূর্ন। অতীতে এই একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯৬৩ সালে এটি স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৬৪ সাল থেকে এটি একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। বহুদিন থেকেই জন্তুদের বায়োডাইভার্সিটি কেনিয়ার জঙ্গলে খোলাখুলিভাবে দেখার ইচ্ছা ছিল। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। ফ্ল্যাটার হলিডেজ ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা স্কুল জীবনের পাঁচ বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম আগস্ট মাসের থার্ড উইকে। কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে পৌঁছে গেলাম কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে। ইমিগ্রেশনের সমস্ত ফর্মালিটিজ শেষ করে যখন এয়ারপোর্টের বাইরে এলাম, ওখানে আমাদের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গাইড জানাল আমাদের জন্য একটা স্পেশাল ডিনার ওয়েট করছে, কাজেই ডিনার শেষ করেই তবে হোটেলে যাব।

আমরা রোস্ট কার্নিভর রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হলাম। ওখানে ওরা আমাদের নানা রকম পশুর মাংস পরিবেশন করল তবে সবই রোস্টেড, রোস্টেড ওভার চারকোল জন্তুগুলোর মধ্যে অস্ট্রিচ , ক্রোকোডাইল, ভেনিসন(হরিণ), সঙ্গে বিফ, ল্যাম্ব, পর্ক ও চিকেন। সে এক এলাহী কারবার, যদিও আমি চিকেন আর ল্যাম্ব ছাড়া আর কিছুই খাইনি, সঙ্গে ছিল নানারকম সালাদ, গ্রেইন, স্প্রাউটস ও নানারকম সস , মেয়োনিজ ইত্যাদি। রাতটা একটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে আমরা রওনা হলাম অম্বুসিলির উদ্দেশ্যে।

চারকোলের আগুনে রোস্ট হচ্ছে মাংস

পৃথিবীর নিরক্ষরেখার প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত কেনিয়ার অ্যাসেম্বলি। এটা আফ্রিকান হাতিদের সুবর্ণরাজ্য। ওদের আকার আমাদের দেশের হাতিদের থেকে বেশ আলাদা, অনেকটা উঁচু আর লম্বাও বটে। তবে দাঁত দুটো খুব লম্বা এবং পুরুষ হাতি ও মেয়ে হাতি সবারই কেনাইন দাঁত (গজ দাঁত বলতে যা বোঝায়) থাকে। যেখানে এশিয়ান হাতিদের শুধু পুরুষদেরই কেনাইন দাঁত থাকে। কান দুটো ও এশিয়ার হাতিদের থেকে অনেক বড়, অনেকটা দেখতে আফ্রিকার ম্যাপের মত। মাথাটাও দেখতে আলাদা, গোল মত।

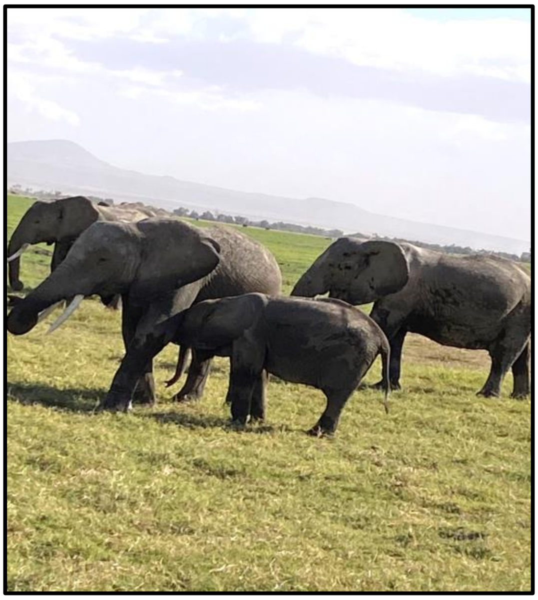

আফ্রিকান হাতি

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি বেলাশেষের সূর্য যখন দিগন্তরেখা অতিক্রম করে আর ও নিচে, ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত রাঙা আলোর মাঝে কাঁটাগাছগুলো যেন বিঁধে রয়েছে। ঘাসগুলো চুলের মতো আকাশের মাথাকে করে দিচ্ছে এলোমেলো। খরা সহ্যকারী বাবুল গাছগুলো এখন শীতের আবহে পাতা ঝরিয়ে কঙ্কালের মতো হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি। আফ্রিকার সূর্যাস্ত বলে কথা। এখানকার সূর্যাস্তের শেষ আলোর ও একটা মায়াবী খেলা আছে। দূর থেকে আমরা কালিমাঞ্জারো পাহাড় এর বরফ ছোঁয়া সূর্যাস্ত দেখলাম। এত সুন্দর! এখানে বলা দরকার যে কালিমাঞ্জারো একটা বিশেষ পাহাড় যার মধ্যে তিনটি আগ্নেয়গিরি আছে। মাউন্ট কালিমাঞ্জারো সর্বোচ্চ ফিরস্টান্ডিং পর্বত। আমরা রাত্রিবাস করলাম শ্নেটিরম আমবাসেলি লজ এর কিছু ছোট ছোট কটেজে। রাতে ভাল কন্টিনেন্টাল ডিনার এর ব্যবস্থা ছিল। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে আমরা মাউন্ট কেনিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। সারা রাস্তা আমরা হাতি, হরিণ, জেব্রা, আর অস্ট্রিচ দেখতে পেলাম।

হরিণের পাল

পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া দেশটার এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গ্রেস্ট উপত্যকা বা গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি। পৃথিবীর দীর্ঘতম এই উপত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬০০ কিলোমিটার। রয়েছে আগ্নেয়চ্ছাস, উৎপন্ন একাধিক আগ্নেয়গিরি, আগ্নেয়হ্রদ ও জলাভূমি। কেনিয়াতে লেক তুর্কানা, লেক নিবাস, লেক নাকুরু, লেক ব্যারিঙ্গচাপিয়ে সব থেকে বড় যে হ্রদ সেটার নাম লেক ভিক্টোরিয়া । ভূতাত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে শুধু কেনিয়াতেই ২১টি আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। টেকটোনিক কারণে এখানকার ভূপ্রকৃতি স্বভাবতই খুবই চঞ্চল বা অস্থির প্রকৃতির। ভূমির ঢাল বরাবর নিচু জায়গা বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে একাধিক নদী। কিনিয়া বলতে লোকে বোঝে মাসাইমারা, আর মাসাইমারা বলতে ' মাসাই ' উপজাতি আর মাইগ্রেশনের কারণে 'মারা' নদী। কিন্তু 'মারা' নদী ছাড়া ও এই দেশের ভেতরে রয়েছে আরো অন্তত চারটি উল্লেখযোগ্য জলপ্রবাহ যেমন তানা, গালানা, করিও ইত্যাদি।

নিরক্ষরেখা কিনিয়ার মধ্যে দিয়ে গেলেও এখানকার ভূপ্রকৃতি বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল হিসেবে প্রাকৃতিক কারণেই কিনিয়াতে বৃষ্টি বেশি হয়না। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধুই ঘাসের জঙ্গল আর অনেক দূরে দূরে রয়েছে খরা সহ্যকারী কিছু গাছ, তাই এটি ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল। এইরকম একটা জায়গা কিন্তু তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য আদর্শ। খাবারের নিরিখে, অসাধারণ এক চারণভূমি। হ্রদের জল আর পাশেই রয়েছে বিস্তীর্ন তৃণভূমি।

" দি গ্রেট মাইগ্রেশন " হিসেবে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ যা দেখার জন্য হাজির হন কিনিয়ার মাসাইমারায়। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, যা কিনা মহাকাশ থেকেও প্রতীয়মান। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা হিসেবেও এটি স্বীকৃত। কিছুটা উপত্যকার পথে কিনিয়া-তানজানিয়া পারাপার করেই জীবনচক্র অতিবাহিত করে এই প্রাণীগুলো। এই পথেই খাবার ও প্রয়োজনীয় জৈবিক ক্রিয়া চলতে থাকে। এ'হেন প্রাকৃতিক পরিবেশে তৃণভোজী প্রাণীদের অফুরন্ত বৃদ্ধি জীবমন্ডলীর পরিবেশে বিনা বাধায় চলতে পারে না , প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাই এখানকার খাদ্য শৃঙ্খলের ওপরের দিকে বসে রয়েছে একাধিক মাংসাশী প্রাণীদের দল। সিংহ, চিতা, লেপার্ড, হায়না, শিয়াল,কুমির, বাজ, শকুন, ব্ল্যাক মাম্বা শ অন্যান্য সরীসৃপের দলও। একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই পশু শিকার ও সংগ্রহ করে উদরপূর্তি করে। এইভাবেই জীববৈচিত্র্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে। জৈবিক চাহিদা না থাকলে মাংসাশী ওই প্রাণীগুলো নিজেদের এলাকা বা টেরিটরি ছেড়ে খুব একটা যাতায়াত করেনা। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হাতি, বুনো মহিষ , জিরাফ, ওয়াটার বাক, জলহস্তীর মত প্রাণীগুলো প্রায়শই এবং নিয়মিতভাবে মাংসাশী প্রাণীদের শিকারে পরিণত হয়ে আসছে। এই সবকটি প্রাণীকেই আমরা এবার দেখেছি, ছবিও তুলেছি।

মাউন্ট কেনিয়া যাবার পথে আমরা নানিউকির ওপর দিয়ে গেলাম যার ওপর দিয়ে কাল্পনিক বিষুবরেখা গেছে বলে মনে করা হয় আর যেখানে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক প্রভাব শুন্য, কিছু লোক পয়সার বিনিময়ে আমাদের পজিটিভ - নেগেটিভ ম্যাগনেটিক স্টিক দিয়ে তা ব্যাখ্যা করল। সেই রাত আমরা মাউন্ট কেনিয়াতে খুব সুন্দর একটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে জঙ্গল ঘুরতে বেরোলাম যার প্রধান আকর্ষণ ছিল গন্ডার আর শিম্পাঞ্জি। জঙ্গল ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা সিংহ ফ্যামিলি দেখলাম যারা একটা গাছতলায় দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। আমাদের ওপরের হুডখোলা গাড়ি ওদের এত কাছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ওদের কোনোরকম হুঁশ ছিলনা। আমাদের পুরো বেড়ানোতেই আমরা অনেক জায়গায় অনেক সিংহ দেখেছে, খুব ভাল লাগছিল ওদের শান্ত ব্যবহার। আফ্রিকার সিংহগুলি এইরকমই। কাউকে ভয় পায়না, ভয় দেখায় ও না। আপন মনে চলতে চলতে যেখানে ইচ্ছে হয় দাঁড়ায়, আবার কখন ও সটান শুয়ে পরে। কারণটা বোধহয় প্রকৃতির ধর্ম। আসলে ওরা পেট ভরে খাবার পায় ।ওরা তো বনের রাজা, তাই অন্য কোনো প্রাণী ওদের বিরক্ত করার সাহস পায় না।

সিংহ পরিবার

এবার বলি জিরাফের কথা। সারা জঙ্গল ভরেই ওরা দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি যে সুন্দর লাগে এদের পালকে দেখতে। তবে এরা সিংহদের প্রধান খাদ্য। যেহেতু জিরাফের আকার সিংহের থেকে অনেক বড় তাই তিন-চারটি সিংহ একসাথে ওদের ধরে কাবু করে ও একসাথে তার মাংস উপভোগ করে। জিরাফের সাথে আরো দুটো প্রাণীকে চড়ে বেড়াতে দেখা যায়, তারা হলো বুনো মোষ আর হরিণ। এদের ভাগ্যও একই রকম, সিংহের পেটে যাওয়া, না হলে সারাদিন ঘাসে ঘাসে ঘুরে বেড়ানো।এবার অস্ট্রিচের কথা বলতেই হয়, কি সুন্দর পাখি! চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। মাঠে মাঠে তারা বিশেষ স্টাইলে দুলে দুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব জোরে দৌড়তেও পারে।

মাউন্ট কেনিয়া থেকে আমরা গেলাম নাইভাসা। লেকের পাশে সুন্দর হোটেল। আমরা নাইভাসা লেকে নৌকো করে জলহস্তী দেখলাম। ওরা নদীর শাপলা জাতীয় উদ্ভিদ খায় আর জলে শরীর ডুবিয়ে চলে বেড়াতে ভালোবাসে। এদের পূর্ণ বয়স্ক দেহের ওজন ২৫০০ - ৩০০০ কেজি। নাইভাসা থেকে আমরা গেলাম নাকুরু লেকে যার চরগুলো ফ্লেমিংগো আর পেলিক্যান পাখিটা ভরা। ফ্লেমিংগো র একটা গোলাপি আভা থাকে পাখনাগুলোতে, তাই দূর থেকে চোরটাকে গোলাপি দেখতে লাগে। আরো অনেক পাখি দেখলাম। গের, ক্রাউন্ড, ক্রেন, ফিস ঈগল , হামেরকোপ, এবং অনেক নাম না জানা সুন্দর সুন্দর পাখি। এখানে সমস্ত গাছ জুড়ে পাখিগুলোর ছোট ছোট বাসা ঝুলছে।

পেলিকন চর

এরপর আমরা গেলাম মাসাইমারা। মাসাইমারা তে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ছিল টেন্টে থাকা। একদিন রাতে হায়না আর হাতি এলো, আর আমাদের সা কি আনন্দ! এখন ও ভাবলে ভালো লাগে। আসলে মাসাইমারার মাসাই উপজাতির নিজস্ব বৈচিত্র্য ধরে রাখার জন্য ইলেকট্রিক সাপ্লাই খুব লিমিটেড। সন্ধে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। তারপর সব কাজ আমাদের টর্চের আলোতে করতে হত। সে এক দারুন রোমাঞ্চ।

মাসাই উপজাতি

এবার মাসাই উপজাতিদের কথা বলে শেষ করি। ওদের ভাষাকে 'মা' ভাষা বলে। একটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি।পশুখাদ্যের কারণেই কখনো কখনো যাযাবর জীবনের পথ। এদের সামাজিক অবস্থানের সূচক হল গবাদি পশুদের সংখ্যা ও পরিবারের সন্তানের সংখ্যা। সে ছেলে মেয়ে যাই হোক না কেন। পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট রিফ্ট ভাললেয়র মধ্যভাগে ১৬শ শতাব্দী থেকে বসবসকারী মাসাই উপজাতিদের সংখ্যা এখন কিনিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডা দেশ মিলিয়ে ২০ লক্ষর ওপর। এই সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতছানি সত্বেও মাসাইরা নিজেদের কৃষ্টি থেকে একজন বিচ্যুত হয়নি। যদিও এখন ওরা ইংরাজি শিখেছে কাজ চালাবার মত করে।

আমাদের সংজ্ঞায় আধুনিক সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তার অনেক কিছুর থেকেই মাসাইরা সেই অর্থে পিছিয়ে রয়েছে। তবে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা সুসংবদ্ধ সমাজ আছে, ওটাকে ওরা ভিলেজ বলে। আমরা যে ভিলেজে গিয়েছিলাম ওখানে ২০৫ জন মাসাই থাকে, ওরা সবাই আত্মীয়। ওদের মধ্যে বিয়ে হয়না, অন্য ভিলেজের ছেলে বা মেয়ে দরকার হয়। ছোট ছোট মাটির ঘর নিজেরাই বানায়। শুকনো কাঠ ঘষে ঘষে আগুন জ্বালায়, আমাদের জ্বালিয়ে দেখালো। দেখে জঙ্গলে দাবানল হওয়ার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এটা আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল. তারপর আমরা নাইরোবিতে ফিরে আসি রিফ্ট ভ্যালি দেখতে দেখতে।